# বাংলার ভাস্কর্য

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আশুতোষ চিত্রশালা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আশুতোষ চিত্রশালা গ্রন্থমালা—৩



প্রথম প্রকাশিত ১৯৪৭ সাল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং আলেকজান্দ্রা
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা হ'তে
শ্রীসত্যচরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# ভূমিকা

বাংলার ছাত্র ও জনসাধারণকে দেশের গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার জন্য ১৯৩৭ সালে আশুতোষ চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা হয়। যুদ্ধ এবং অন্যান্য বহু অসুবিধা সত্ত্বেও গত দশ বছরে এই সংগ্রহাগার পূর্ব্ব-ভারতের, বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকলার একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এখানে সংগৃহীত শিল্পনিদর্শন সমূহের সাহায্যে বাংলার শিল্পকলাকে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করবার আয়োজন করে চিত্র-শালার কর্মীরা এক নূতন প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্য এক সুমহান্ ঐতিহ্যের পরিচায়ক। আশা করি এই পুস্তিকা বাংলার ভাস্কর্য সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ জাগাবে।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে বাংলার মূর্তিকলা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকলেও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার মূর্তিশিল্পের কোন নিদর্শন বাংলার মাটিতে আজ পর্যন্তও খুব বেশী পাওয়া যায় নি। বাংলায় আবিষ্কৃত অসংখ্য মূর্তির প্রায় সবই খৃষ্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীতে গড়া হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় অনেকে বাংলার মূর্তিকলা বলতে কেবলমাত্র পাল ও সেন আমলের পূর্বভারতীয় শৈলীর শিল্পকলাকেই বুঝে থাকেন। তা'ছাড়া তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের উক্তিও কিছুটা এই ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী। লামা তারনাথ তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিকগ্রন্থে বলেছেন যে পাল সম্রাটগণের আমলে ধীমান ও বীতপালো বলে দু'জন শিল্পী গৌড়ীয় মূর্তিকলার প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্যই বাংলায় আবিষ্কৃত এই যুগের মূর্তিশিল্পে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সমসাময়িক মূর্তিকলা থেকে বহু বিষয়ে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল। কিন্তু তা হলেও আদর্শ ও ভাবধারার দিক থেকে বাংলার মূর্তিশিল্প ভারতবর্ষীয় মূর্তিশিল্পের প্রবহমান ধারার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য; বাংলার মূর্তিশিল্পের পক্ষে ভারতবর্ষীয় মূর্তিশিল্পধারা থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায়না।

পাথরে গড়া মূর্তিশিল্পের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকেই চলে আসছে—তবে মূর্তিনির্মাণে প্রস্তরের ব্যবহার খৃষ্ট জন্মের ৩।৪শ বছর আগেও খুব ব্যাপক ছিলনা। সিন্ধুসৈকতে আবিষ্কৃত তাম্রপ্রস্তর

যুগের মূর্তিগুলির মধ্যে পাথরের মূর্তি থাকলেও মাটিতে গড়া মূর্তির প্রাধান্যই সে যুগেও খুব বেশী ছিল দেখা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে কাষ্ঠময়ী মূর্তিরও বহুল উল্লেখ আছে; প্রাচীন যুগের আবিষ্কৃত মূর্তিতে মাটীর মূর্তির বাহুল্য আর সাহিত্যে কাঠের মূর্তির উল্লেখ দেখে সহজেই মনে হয় যে সে যুগে কাঠ বা মাটিতে গড়া মূর্তিরই বেশী প্রচলন ছিল।

ঐতিহাসিক যুগের আদিতে মহারাজ অশোক স্থাপিত স্তম্ভসমূহের শীর্ষে যে সব পশুমূর্তি দেখা যায় শিল্প বস্তু হিসেবে সেগুলি খুবই উল্লেখ যোগ্য। এই মূর্তিগুলির দেহ স্থূল হলেও দৃঢ়বদ্ধ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পেশীবহুল এবং দেহে ও মুখে আত্মসমাহিত শক্তির একটা ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। এই মূর্তিগুলির পশ্চাতে দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়, চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে। তার কিছু পরবর্তী যুগের গড়া উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তিতে দেহ গঠনের সুডোল বলিষ্ঠতার পরিবর্তে একটা শ্লথ মাংসলতার আবির্ভাব দেখা যায়। তার কিছুকাল পরেই মধ্য-ভারতের ভারহুতে প্রস্তরমূর্তি-শিল্পের একটা সুপরিণত বিকাশ চোখে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় অশোকের কাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে গড়া ভারহুতের মূর্তি নির্মাণকাল পর্যন্ত মূর্তি নির্মাণ শিল্পে এমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা পরবর্তী যুগে সঙ্ঘটিত পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত। ভারহুতের মূর্তিগুলির গঠন চাপা, ভঙ্গী গতিহীন। কিছুকাল পরেকার সাঁচীর স্তূপতোরণের মূর্তিগুলির দেহ সুস্পষ্ট ডৌলের, ভঙ্গী অপূর্ব গতিশীলতার সম্ভাবনায় পূর্ণ। প্রতিটি পর্বে সম্ভবত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ও সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের আবেদন রয়েছে যার প্রকাশ্য রূপ খুব প্রত্যক্ষ নয়। পারসিক ও গ্রীক রাজশক্তি ও সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক ও

সঙ্ঘাতের কথা আমরা জানি ; আরও জানি ভারতের আদিম ভাবধারার সঙ্গে, এমন কি আর্যগণের আগমনকাল থেকেই, বিদেশাগত ভাবধারার আঘাতের মধ্য দিয়ে একটা সামঞ্জস্যেরও প্রয়াস চলেছে। প্রত্যক্ষভাবে এই সঙ্ঘাতের ফল আমরা কুষাণগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজগতে দেখতে পাই। ইতিমধ্যে ধর্মে ও সমাজে বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা আপন বৈশিষ্ট্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছিল। বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে ধর্মের সঙ্গে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়তে দেখা যায়।

এইরূপ বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের পর খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পকে সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে একটা অপূর্ব ও সুপরিণত রূপ ধারণ করতে দেখতে পাই। রাজনীতি ও সভ্যতার ইতিহাসেও এই যুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হলেও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষপাদ থেকে প্রায় দুইশত বৎসর যারা উত্তর ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য ভোগ করেছিল সেই কুষাণরাজবংশ আদপে বিদেশী এবং মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিল। মনে হয় বহু বৈদেশিক ভাবধারা স্রোতজলের মতই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গিরিপথগুলি বেয়ে কুষাণদের সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে। খৃঃ ৩২০ অব্দে পাটলীপুত্রে যখন গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কুষাণ সাম্রাজ্যের ছিন্ন ভিন্ন অংশগুলি তখন প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু জনগণের ধমনীতে নবরক্ত সঞ্চালিত হওয়ায় রাজনীতিক্ষেত্রের মত ধর্ম ও সংস্কৃতির জগতেও কুষাণযুগে যে অস্থিরতার আবির্ভাব হয়েছিল তাকে নূতন রূপে নূতন সভ্যতায় রূপায়িত করে তুলবার দায়িত্ব গুপ্তরাজবংশের উপর পড়ল। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র থেকে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং

উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি পর্যন্ত গুপ্তরাজগণের অধীনে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল দীর্ঘদিন স্থায়ী না হলেও সুশাসন ও সংস্কৃতির বিকাশের উপর আনুকূল্যের প্রাচুর্য দ্বারা গুপ্ত রাজত্বকাল তার অস্তিত্বকে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করে রেখে গিয়েছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রভূত অনুশীলনের ফল এই যুগের ভারতবর্ষকে যেমন ধনসম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, আধ্যাত্ম সাধনার দিক থেকেও এ যুগ যে তেমনি সাফল্য লাভ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। গভীর প্রজ্ঞা ও বিপুল আর্থিক সমৃদ্ধি অন্যান্য সংস্কৃতির মত সাহিত্য ও শিল্পকেও একটি চূড়ান্ত অনুশীলন ও সুপরিপক্ক বিকাশের অবস্থায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল।

এই যুগের অবসানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলভেদে ভারতীয় ভাস্কর্যে কিছু কিছু বৈচিত্রের সমাবেশ দেখা গেলেও শিল্পের অন্তর্নিহিত মূল সুরটি ছিল এক। স্থানভেদে, একই সময়ে গড়া মূর্তির গঠন ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে খুব কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটেছিল এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষীয় মূর্তিকলা এই যুগের প্রায় অবসানকাল পর্যন্ত মোটামুটি একই সাধনার ক্রমবিকাশের সূত্রে গাঁথা। প্রকাশভঙ্গীর মূলগত ঐক্যের সঙ্গে মোটামুটি যে একটা সাদৃশ্যগত ঐক্যও গুপ্তযুগ পর্যন্ত দেখা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকেই সে ঐক্য কিন্তু ক্রমে শিথিল হয়ে পড়তে থাকে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান সূচিত হয়ে উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির উদ্ভব হতে থাকে। প্রাচীন রাজন্যবর্গের চক্রবর্তিত্বের আদর্শ বিলুপ্ত হয়ে এই ক্ষুদ্র রাজশক্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘোর বিরোধে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করে। এই বিরোধের ইতিহাসে পূর্ব-ভারতে গৌড় নামে একটি অশ্রুতপূর্ব জাতির অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তরাঞ্চলের মৌখরী ও পুষ্পভূতি ইত্যাদি রাজশক্তিগুলির সুদীর্ঘদিনের বিরোধের মধ্যে এই গৌড়জাতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস লিখিত আছে। প্রাচীন গৌড় বর্তমান বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন বিভাগগুলির সমষ্টি, পৌরাণিক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বারেন্দ্র) ও সুহ্ম-রাঢ় জাতির উপনিবেশ। এই গৌড় যখন পূর্বে কামরূপ ও পশ্চিমে কান্যকুব্জের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত তখন বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলও (তৎকালীন সমতট) একটি বৌদ্ধরাজবংশের অধীনে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল।

সুদীর্ঘ দিনের যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বাংলায় গুরুতর অরাজকতা দেখা দেয়। কিন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহের দিনেও শিল্পীকে গড়ে তুলবার কাজেই ব্যস্ত দেখি। সমতটের বৌদ্ধরাজবংশের আনুকূল্যে অষ্টধাতুতে সে মাধুর্যপূর্ণ মূর্তি গড়ল। পোখরণায় আর বানগড়ে তার গড়বার হাত ছিল মাটিতে; আর উত্তর বাংলার কোথাও সে পাথরের কাজ করেছে যার পরিচয় পাই পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রাচীরে। এই যুগের শিল্প উত্তর ভারতের ভাবধারাতে সমৃদ্ধ, উত্তর ভারতীয় গতানুগতিক গঠন ভঙ্গীতে বিশিষ্ট। কিন্তু এই ভাবধারা ও গঠনভঙ্গীকে আত্মসাৎ করে একটা নিজস্ব পথ রচনায় এই যুগের শিল্পীর একটা প্রচেষ্টা ছিল, সেই প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণ রূপ নিতে দেখতে পাই পালরাজবংশের আমলে। দীর্ঘদিনের অরাজকতার পর গোপালদেবের নির্বাচনে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গুপ্তবংশের অবসানের পর থেকে যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভিতর দিয়ে যে আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, জাতীয় জীবনের বিকাশে যে নূতন চেতনা ও নূতন পরীক্ষার সূচনা হয়েছিল, দীর্ঘকালের সংগ্রাম ও দুঃখকষ্ট

ভোগের মধ্যে যার জন্য প্রস্তুতি দেখতে পাই, পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠায় যেন তারই উদ্বোধন হল। রাজনৈতিক প্রভাবে, ধনসম্পদে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প গৌরবে পালবংশের আমলে বাংলা এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকেই বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে বিব্রত হলেও পাল রাজবংশ প্রায় চারশ' বছর ধরে বাংলায় রাজদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। অবশেষে ১১শ শতাব্দীতে পালগণ কর্ণাট দেশাগত সেন বংশীয়দের দ্বারা স্বদেশচ্যুত হয়ে বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পালরাজগণ ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত থাকলেও আচরণে অত্যন্ত উদারভাবাপন্ন ছিলেন ; দক্ষিণাগত সেনগণ কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য পন্থী। এই সেনগণের আমলে বাংলার সভ্যতা যেমন অত্যন্ত মাধুর্যধর্মী হয়ে উঠেছিল বাংলার সুখ-ঐশ্বর্যও সম্ভবত সাময়িকভাবে তেমনি বৃদ্ধিলাভ করেছিল। আবার এদের আমলেই বাংলা স্বদেশীয় রাজগণের হস্তচ্যুত হয়ে নবাগত তুর্কীদের হাতে চলে যায়।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে বাংলায় শিল্পচর্চার অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বানগড় ও তমলুকের মাটির মূর্তি ও খেলনাগুলিতে খৃঃ পূঃ প্রথম থেকে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত কালের শিল্প-প্রচেষ্টার পরিচয় রয়েছে। হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাংলার বহু মন্দির, চৈত্য ও সঙ্ঘারামের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের যে সকল গ্রন্থপাঠে প্রাক্পাল, পাল ও সেন আমলের শিল্প সমৃদ্ধির কথা জানতে পারা যায় কলহনের রাজতরঙ্গিণী, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, ধোয়ীর পবনদূত, তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের প্রাচ্যের বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাস ইত্যাদি তাদের অন্যতম। বিভিন্ন রাজার আমলে উৎকীর্ণ

তাম্রশাসন গুলিতে আবার বহু মন্দির ও দেবমূর্তির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিল্পীর নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

শুধু ইতিহাসেই নয়, প্রাচীন মূর্তিকলার বহু নিদর্শন যে বাংলার প্রায় সর্বত্র ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তার চাক্ষুষ প্রমাণেরও অভাব নাই। আর আছে বহুসংখ্যক মৃত্তিকা স্তূপ। বাংলার প্রাচীন নগরগুলি এবং নগরের অলঙ্কার স্বরূপ শিল্পসম্ভার খচিত মন্দির ও চৈত্য-গৃহগুলি বাংলার সুখ ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হলেও বহুরত্ন সমৃদ্ধ তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি এই ধরণের অনেক মৃত্তিকা স্তূপের অন্তরালেই আত্মগোপন করে আছে।

বঙ্গে বহু প্রাচীন কাল থেকেই মূর্তিকলার অস্তিত্ব থাকলেও পাল-পূর্ব যুগের পাথর গড়া মূর্তি এ পর্যন্ত সংখ্যায় খুব কমই আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করে নেওয়া ভাল যে প্রাচীন মূর্তিগুলির প্রায় কোনটিতেই কোন লেখ কিম্বা তারিখ না থাকায় সেগুলির কাল নির্ণয়ে যে সকল বিশেষ উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, গঠন ভঙ্গীর বিশ্লেষণ তাদের অন্যতম। এই কারণে এই সমস্ত মূর্তির নির্ণীত কাল সম্পর্কে সকল পণ্ডিত একমত হতে পারেন নি। সে যা হোক, বিভিন্ন যুগে গড়া মূর্তির গড়নে যে কতগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে এ সম্পর্কে তাদের মধ্যেও মতভেদ নাই। এবং যেখানে মূর্তির কাল নির্ণয়ে সন তারিখ সম্বলিত কোন প্রমাণ উপস্থিত থাকে না সেখানে গঠন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করেই মূর্তির কাল নিরূপণ করে নিতে হয়।

বাংলায় আবিষ্কৃত প্রস্তর মূর্তির যেগুলিকে প্রাক্‌পাল যুগের বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে তাদের মধ্যে রাজসাহী জেলার নিয়ামতপুরের একটি সূর্যমূর্তি, বিহারৈল গ্রামের বুদ্ধমূর্তি, বগুড়া জেলাভুক্ত দেওরা গ্রামের

সূর্যমূর্তি, মুর্শিদাবাদ সালারের একটি চক্রপুরুষের মূর্তি, পাহাড়পুর মন্দির-প্রাচীরের পৌরাণিক মূর্তিসম্বলিত ফলকগুলি ও সুন্দরবন অঞ্চলের একটি সূর্যমূর্তিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিয়ামতপুর, বিহারৈল ও দেওরার মূর্তিগুলি রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান চিত্রশালার, সালারের মূর্তিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও সুন্দরবনের মূর্তিটি বর্ত্তমানে আমাদের আশুতোষ চিত্রশালার সম্পত্তি। নিয়ামতপুরের মোটাদানার বেলে পাথরে গড়া সূর্যমূর্তিটির মাথায় বিচিত্র মুকুট, কাঁধ সমান উচুকরে ধরা দুই হাতে দুইটি সনাল পদ্ম, দেহে আজানুলম্বিত পুরু অঙ্গরাখা, দুইদিকে বামনাকৃতি অনুচরদ্বয় দণ্ডী ও পিঙ্গল। সাধারণতঃ সূর্যমূর্তির পায়ে যে একজোড়া গুরুভার উচু পাদুকা ও পাদপীঠ তলে সপ্তাশ্ববাহিত রথ দেখা যায় নিয়ামতপুরের মূর্তিটিতে তা নেই। মূর্তির মুখমণ্ডল ও দেহের গঠনে তীক্ষ্ণ রেখার প্রাধান্য এবং দেহের আজানুলম্বিত পুরু অঙ্গরাখাটি কুষাণ যুগের রাজকীয় মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সকল গুণ থাকাতে মূর্তিটিকে গুপ্ত যুগেরও পূর্ববর্তী ও এতাবৎ বাংলায় আবিষ্কৃত প্রস্তর মূর্তিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলেই মনে হয়।

বিহারৈলের বুদ্ধমূর্তিটি চুনারের বেলেপাথরে গড়া। এই মূর্তির গায়ের সূক্ষ্ম আবরণ, মুখমণ্ডলের সুকুমার ভাব, দেহের নমনীয়তা ও মসৃণতা, বামপদ ঈষৎ আনত করে দাঁড়াবার ভঙ্গীটি গুপ্তযুগের সারনাথের কোন কোন বৌদ্ধমূর্তির অনুরূপ। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এবং অর্ধ মুদ্রিত নয়নের ধ্যানগম্ভীর ভাব, স্কন্ধদ্বয়ের গড়ান প্রশস্ততা, গ্রীবা ও বক্ষের কোমলতা এবং দেহের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগোল গঠন ভঙ্গীর দরুণ মূর্তিটিকে অনায়াসেই গুপ্তযুগের সৃষ্টি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। পরবর্তী

যুগের মূর্তিগুলির গঠনভঙ্গী বিচার করতে হলে বিহারৈলের এই বুদ্ধমূর্তি তথা গুপ্তযুগের মূর্তিশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কারণ এই ধারায় গড়া মূর্তির বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরবর্তী সকল যুগের মূর্তিরই অল্প-বিস্তর সম্বন্ধ দেখা যায়।

গুপ্ত পরবর্তী যুগের মূর্তিসমূহের মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছিল সুন্দরবনে আবিষ্কৃত ও বর্ত্তমানে আমাদের চিত্রশালায় সংগৃহীত সূর্যমূর্তিটিতে তার অনেক কিছুর সমাবেশ দেখা যায়। দণ্ডায়মাণ মূর্তিটির জানুর নিম্নভাগ পাদপীঠের দ্বারা আবৃত। মস্তকের পশ্চাতে অণ্ডের আকৃতির প্রভামণ্ডল, মাথায় রত্নমুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে রত্নহার, অলঙ্কার খচিত উদরবন্ধ, কটীবন্ধে তরবারি লম্বিত। দেহ থেকে অনতিদূরে ধৃত হাত দুটিতে দুইটি সনাল কমলস্তবক। জঙ্ঘাদ্বয়ের সম্মুখে কষা ও রশ্মিধারী সারথি অরুণের আবক্ষ দেহ। মূর্তির দুইদিকে সম্ভবতঃ দুইটি শরসন্ধানী নারীমূর্তি ছিল ( উষা ও প্রত্যুষা )—এই দুই মূর্তির অংশ-বিশেষ মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। রথপ্রাচীরে তিনটি সুন্দর চৈত্যগবাক্ষের অনুকৃতি দেখা যায়। পীঠের কেন্দ্র ভাগে উৎকীর্ণ সূর্যের রথের একটি চক্র ও সাতটি অশ্ব। রথেরও তলভাগে দুইপ্রান্তে দুইটি প্রহরণ ধারী ( পলায়ন পর ? ) যোদ্ধার মূর্তি সম্ভবত সূর্যের আগমনে অপসৃয়মান অন্ধকারের নির্দ্দেশক। ( ১ম ছবি )

মূর্তির গঠন ভঙ্গীতে গুপ্তযুগের যে সমস্ত লক্ষণ চোখে পড়ে সেগুলির মধ্যে সুপূর্ণ মুখমণ্ডল, স্থূল নিম্নোষ্ঠ, গড়ান স্কন্ধ, প্রশস্ত বক্ষদেশ ও দেহের মাংসলতা অন্যতম। অর্দ্ধমুদ্রিত ধ্যানস্তিমিত চক্ষুর জায়গায় তারকা চিহ্নিত অর্দ্ধোন্মুক্ত চক্ষুগোলকের উপরে স্থূল পল্লব, বক্ষের সমতলতা ও এইরূপ কয়েকটি লক্ষণ গুপ্তযুগের মূর্তিশিল্পের সঙ্গে এই মূর্তিটির পার্থক্য সূচিত

করলেও উপরোক্ত মুখ্য গুণগুলি থাকায় মূর্তিটিকে সহজেই গুপ্তযুগের সমীপবর্তী বলে অভিহিত করা চলে। আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ—সপ্তম শতাব্দীর এই মূর্তিটি আমাদের চিত্রশালায় সংগৃহীত বঙ্গদেশীয় প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। মুখমণ্ডলের উদার গাম্ভীর্য, দেহের পেলবতা, কমল স্তবকের গঠন পারিপাট্য ও অশ্বগুলিতে স্পষ্ট গতিশীলতার জন্য মূর্তিটিকে একটি উচ্চস্তরের ভাস্কর্যের নিদর্শন বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

এই সূর্যমূর্তিটিতে গুপ্তযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে যে পার্থক্য দেখা দিল পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীরের প্রস্তর ফলকগুলিতে সেই সব পার্থক্য ছাড়া আরও বহু নূতন বৈচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। পাহাড়পুরের মন্দিরটি পালসম্রাট ধর্মপালদেব প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সোমপুর বিহারের কেন্দ্র। উল্লিখিত প্রস্তর ফলকগুলি মন্দিরের নিম্নতমতলের প্রাচীরে খচিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে বৌদ্ধমন্দির সংলগ্ন হলেও ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুর প্রায় সবই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বিগণের পুরাণ কাহিনী থেকে সংগৃহীত। এইগুলি ছাড়া মন্দির প্রাচীরের অলঙ্করণে যেসব মূর্তি-খচিত মৃৎফলক ব্যবহার হয়েছিল সেই সব ফলকে উৎকীর্ণ বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে। বৌদ্ধমন্দিরের প্রাচীর সজ্জায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুমোদিত মূর্তি কেন ব্যবহার হয়েছিল তার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা এখন আর সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্ম বেদানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্ম বহুল ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণের মধ্যেও আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিমা পূজার প্রবর্তন হয় এবং পুরাণ এবং তন্ত্রানুমোদিত ব্যবহারিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই দিক থেকে তাদের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য

প্রতিষ্ঠিত হয় ; কিন্তু তা সত্বেও এই দুই ধর্মের মূলগত বিভেদ কোন দিনই বিলুপ্ত হয় নাই। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবর্ষে চিরকালই একটা বিদ্বেষের ভাব বর্তমান ছিল বলে অনুমিত হয়ে আসছে। অবশ্য ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজশক্তিকে নিজের ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও উদারতার ভাব অবলম্বন করতে দেখা গিয়াছে। গুপ্ত সম্রাটগণ অত্যন্ত অনুগত ভাগবতপন্থী হলেও তাদেরই আমলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। তেমনি বাংলার পাল সম্রাটগণ ধর্মমত হিসেবে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁরা যে যথেষ্ট উদার ছিলেন একথা তাদের তাম্রশাসনগুলি পাঠে জানা যায়। এই পাল-রাজগণ যখন বাংলায় রাজত্ব করতেন তখন বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই উভয় ধর্মের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা উদারতার ভাব এবং শৈব ও বৌদ্ধ মতের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রচেষ্টার প্রয়াসও হয়েছিল। আমাদের চিত্রশালায় একাদশ শতাব্দীর অষ্টধাতুতে গড়া একটি দাঁড়ান শিবমূর্তির পশ্চাদপটের শীর্ষে এমন একটি মূর্তি উৎকীর্ণ আছে তাকে ধ্যানীবুদ্ধ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। অনেকে এই মূর্তিটিকে বাংলাদেশে শিব ও বুদ্ধের সমন্বয় প্রচেষ্টার নিদর্শন বলে মনে করেন। তন্ত্র ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য পাঠ করলে বাংলাদেশে সত্যসত্যই শৈব ও বৌদ্ধ মতের যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। পাহাড়পুরে এই ধরণের সমন্বয় নির্দেশক কোন মূর্তির অস্তিত্ব না থাকলেও মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সন্নিবিষ্ট করায় সম্ভবত একটা উদারতা ও সমন্বয়ের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া খুব অন্যায় বলে মনে হয় না। অবশ্য এ থেকে বিপরীত ধারণা হওয়াও অসম্ভব নয়।

বিষয় বস্তুর দিক থেকে প্রাচীরে খচিত প্রস্তর ফলকগুলিকে কয়েকটি

ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই সব ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তির কতকগুলি বিভিন্ন দেব-দেবী, দিকপাল, নর্তকী, দ্বারী ইত্যাদির অনুকৃতি ; একাধিক মূর্তি সম্বলিত ফলকে যেখানে পৌরাণিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তার কতকগুলি শিব ও শৈব সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট ও অবশিষ্টগুলি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বলে নির্দ্দেশ করা যায়। দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, যম, কুবের, যমুনা, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদির মূর্তিই উল্লেখযোগ্য। শৈব ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ফলকগুলিতে শিব ও কৃষ্ণকে বিভিন্ন অবস্থায়ও বিভিন্ন সঙ্গীর সঙ্গে চিত্রিত দেখা যায়।*

বিষয় বস্তুর দিক থেকে এই ফলকগুলি যেমন ঐশ্বর্যপূর্ণ, গঠন ভঙ্গীর দিক থেকে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি আবার তেমনি বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। কূর্মবাহিত যমুনার মূর্তিতে, শিবের হলাহল গ্রহণ (?) বিষয়ক ফলকে, এবং অন্যান্য কয়েকটি মূর্তির গঠনে গুপ্ত যুগের সুপরিজ্ঞাত লক্ষণগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব মূর্তির মুখাবয়ব সুগোল, স্কন্ধ প্রশস্ত ও গড়ান, বক্ষের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুকুমার ও বর্ত্তুলাকৃতি, দেহ মাংসল ও পেলব, অলঙ্কার স্বল্প ও দাঁড়ানোর ভঙ্গী গুপ্তযুগের মূর্তিগুলির দাঁড়ানোর ভঙ্গীর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। এই সব লক্ষণ থাকবার ফলে মূর্তিগুলিকে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শতাব্দীতে গড়া বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

অন্য কতকগুলি ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তির গঠন-ভঙ্গীর সঙ্গে এই মূর্তিগুলির আবার একেবারেই কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মূর্তিগুলির পাশাপাশি রাখলে সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বলে মনে হলেও তার মধ্যে পাকা হাতের স্পর্শের এবং কতগুলি বিশিষ্ট স্বকীয়তারও সন্ধান

* পাহাড়পুরের মূর্তি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্যের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়। বালি এবং সুগ্রীবের যুদ্ধ, হনুমানের গন্ধমাদন আনয়ন ইত্যাদি মূর্তিগুলি এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

এই মূর্তিগুলিতে রেখা, বিশেষ করে যে রেখা যত্ন করে ডৌলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি সেই ধরণের রেখার বহুল ব্যবহার চোখে পরে। মূর্তিগুলির ভ্রূ ও নাসিকার গঠন তীক্ষ্ণ, চোখ বাদামী এবং ঠোঁট প্রশস্ত। এই চোখ আর ঠোঁট গভীর রেখা দিয়ে পরিবৃত হওয়ায় চোখের চারিদিকের ও ঠোঁটের দুইদিকের তলদেশবর্তী গভীরতা ও এই গভীরতা জনিত ছায়া সহজেই চোখে পড়ে। কেশ, কণ্ঠ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের ভাঁজ নির্দেশ করতে যে সব রেখার প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলিকে মার্জিত করে মিলিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়াস দেখা যায় না, বরং সহজ ও স্বাভাবিক রূপ দেওয়ার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রেখাগুলিকে ইচ্ছা করেই গভীর ও অমার্জিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। মূর্তিগুলির দেহ খর্ব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ডৌল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বোধ অপেক্ষা নির্মাণে অনায়াস দ্রুততারই পরিচয় বহন করছে। অন্যদিকে মূর্তিগুলি স্বাভাবিক গতি-শীলতা-গুণে গরিষ্ঠ।

গুপ্তযুগের মার্জিত ধারার মূর্তিকলার সঙ্গে এই ধরণের মূর্তির দূরত্ব যেমন সুস্পষ্ট এই মন্দিরেরই প্রাচীরে খচিত অসংখ্য মৃৎফলকে উৎকীর্ণ মূর্তির সঙ্গে এদের সাদৃশ্যও তেমনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিকে খুব সহজেই একটি স্বাধীন শিল্পধারার নির্দ্দেশক বলে চেনা যায়। এই শিল্পধারাটি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে সম্ভবত বহুকাল থেকেই বর্তমান ছিল, এবং বহু পরবর্তীকালের মন্দিরসমূহে খচিত ফলক থেকে মনে হয় যে এই ধারা পরবর্তীকালেও বহুল পরিমাণে আপনার স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখতে পেরেছিল। বাংলায় মূর্তিগঠনোপযোগী প্রস্তর অত্যন্ত

দুর্লভ হওয়ায় বাংলার শিল্পপ্রচেষ্টা বহুকাল পর্য্যন্ত সুলভ মৃত্তিকাকেই আশ্রয় করেছিল। আধারের নিজস্ব বিশেষত্বের ফলে কতকগুলি গুণ সহজেই সেই আধারে গড়া মূর্তিকে আশ্রয় করতে দেখা যায়। দ্রুত মূর্তিগঠনে ও অনায়াসেই বহু বিচিত্র ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলার পক্ষে পাথর থেকে মাটিই বেশী উপযোগী। বহু যুগ ধরে মাটির উপাদানে মূর্তি গঠিত হওয়ায় সম্ভবত বাংলাদেশে একটা বিশেষ ধারার প্রবর্তন হয়েছিল, তাই সহসা নূতন উপাদানে মূর্তিগঠন করতে গিয়েও শিল্পী প্রাচীন ধারার বিশেষত্বগুলি ভুলতে পারেনি। নূতন আধারে পুরাতন ধারার গুণগুলি গোড়াতে খাপ খায়নি। এই ধারার মূর্তিগুলিকে আমরা তাই মৃতিকায় যারা মূর্তি গঠন করত, হাত ছিল যাদের দ্রুত, মার্জিত ডৌল, দেহের ভঙ্গী ও গতির দিকে যাদের সুকুমার শরীর গঠন থেকেও গভীর দৃষ্টি ছিল সেই প্রাচীনপন্থী শিল্পীদের কাজ বলে গ্রহণ করতে পারি। বাংলায় উদ্ভূত প্রাচীন শিল্পধারার এরাই ছিল বাহক। দ্রুত, সুলভ এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যক মূর্তি গঠন করে এরা শিল্পধারাকে জনসাধারণের সহজলভ্য করেছিল। পাথরে গড়া মূর্তির প্রচলনে এদের কাজ বাধাগ্রস্ত হল। শিল্প ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে ত্যাগ করে বিত্তশালী ব্যক্তির অনুগত হল। শিল্পের নূতন অনুরাগিদের রুচি ছিল ভিন্ন, নূতন আধারে প্রাচীন ধারার অনুসরণে প্রতিকূলতাও ছিল অনেক। এই ধারার অনুসরণ তাই আর অধিক উৎসাহ লাভ করে নাই। বহুদিন থেকেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মার্জিত রুচির শিল্পধারার সঙ্গে বাংলার পরিচয় ছিল। বাংলার মাটিতেও সেই ধারার প্রবর্ত্তন ও অনুসরণের চেষ্টা যে না চলেছিল তা'নয়। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের অপরিহার্য সঙ্ঘাতের ফল অচিরেই দেখা দিল। বাংলার শিল্পী প্রাচীন ধারায় ও প্রাচীন উপকরণে মূর্তিগঠন ত্যাগ করলেও তার প্রতিভা সমস্ত প্রাচীন বৈশিষ্ট ত্যাগ করে

নূতনকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারল না। নূতন উপকরণে গড়া মূর্তিতেও তাই অনেক পুরোণো গুণের প্রকাশ দেখতে পাই।

এই সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়ে যে সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা চলেছিল পাহাড়-পুরেরই কতকগুলি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তিতে তারও নিদর্শন দেখা যায়। অপূর্ব দেহভঙ্গী বিশিষ্ট একটি নর্ত্তকী মূর্তির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে দেখা যায়, মূর্তিতে অনেক প্রাচীন গুণ বজায় রাখলেও শিল্পী প্রাচীন ধারা থেকে বহুদূর সরে এসেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্রুত সমীপ্ত বন্ধুরতার স্থলে বর্তুল ডৌলের আবির্ভাব হয়েছে, গভীর ও তীক্ষ্ণ রেখাগুলি বহুলাংশে মার্জিত হয়েছে, চক্রের মত চক্ষুগুলি বাদামী আকার নিয়েছে—সর্বোপরি গতির সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে একটা মার্জিত শ্রী। এই পরিবর্তিত অবস্থার দিকে শিল্পী আরও অগ্রসর হয়ে গেছে কৃষ্ণ বলরাম ইত্যাদি এবং ইন্দ্র, যম, কুবের, অগ্নি, অবলোকিতেশ্বর, গণেশ ইত্যাদির মূর্তিতে। এই সব মূর্তির ললাট সমতল, ভ্রু বঙ্কিম, নাসিকা তীক্ষ্ণ, চক্ষুর তলায় ও ঠোঁটের কিনারে ঈষৎ গভীরতা ; বক্ষদেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনে গুপ্তযুগের মাংসল পেলবতা ও বর্তুলতার স্থানে কঠিন মসৃণতার আবেশও দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ মূর্তির চক্ষু, ঠোঁট, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের ভাজের রেখা তীক্ষ্ণ। চোখের তলা ও ঠোঁটের পাশের গভীরতা মূর্তিগুলির মুখে একটা ভাবালুতার বিকাশ ঘটিয়েছে, রেখার তীক্ষ্ণতা ও দেহের মসৃণতা দেহকে করে তুলেছে কঠিন। মুখের এই ভাবালুতার প্রথম অস্তিত্ব দেখা গিয়েছিল বিহারে সুলতানগঞ্জের ৫ম শতাব্দীর এক বুদ্ধ মূর্তিতে।

পরবর্তী যুগের পূর্ব্বভারতীয় শৈলীর মূর্তিকলার সঙ্গে এই ভাবালুতা একটী অপরিহার্য গুণরূপে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। পাহাড়পুরের এই তৃতীয়

দলের মূর্তিগুলিকে পূর্বেই গুপ্তযুগের মূর্তিকলার সঙ্গে বাংলার চিরাচরিত ভাস্কর্য ধারার সামঞ্জস্য প্রচেষ্টার ফল বলে উল্লেখ করেছি। এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই দুই ধারার সঙ্ঘাতের ফলে যে নবীন ধারার উদ্ভব হল পালযুগে সেই ধারাই যেন সুপরিণত হয়ে পূর্বভারতীয় শৈলীর মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আধার হিসাবে শুধু মাটিকে অবলম্বন করেই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রবল শিল্পধারা যে বাংলায় বর্ত্তমান ছিল পাহাড়পুরের মৃৎফলকগুলি তারই পরিচায়ক। এই ধরণের শক্তিশালী শিল্পধারা সহসা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না—এই ধারার পশ্চাতে বহু যুগের সাধনার পরিচয় সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। বাঙ্গালী শিল্পীর যেমন বহুযুগের অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে মৃত্তিকাকে মূর্তিতে রূপায়িত করা অনায়াস সাধ্য হয়ে পড়েছিল —সেই মূর্তিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও বহুদিনের অনুশীলনের ফলে তেমনি আপনি দেখা দিয়াছিল। পরবর্তীকালে বাংলার শিল্পের প্রাচীন ধারা আর অবিমিশ্র ভাবে প্রবাহিত হয় নাই একথা সত্য ; কিন্তু গুপ্তযুগের ধারায় আত্মনিমজ্জন না করে সেই ধারার কতগুলি উল্লেখযোগ্য লক্ষণকে আত্মসাৎ করে—বাংলার প্রাচীন শিল্পের ধারাই যেন এই নূতন আধারে নব-কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল। অতীতের বাংলার নিজস্ব মূর্তিকলাকে যাতে বুঝতে পারা যায় ও পরবর্তিযুগের মূর্তিকলার উদ্ভবকে যাতে সহজ-ভাবে অনুসরণ করা যায় সেইজন্যই এই ভাববিপ্লব গুলির কথা ও পাহাড়পুরের মূর্তিকলার কথা এখানে একটু বিশেষ করে উল্লেখ করা হল।

খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর মূর্তি সংখ্যায় খুব কম আবিষ্কার হয়ে থাকলেও আমাদের চিত্রশালায় এই যুগের প্রায় দশটি মূর্তি আছে। এই

যুগের কোন কোন মূর্তিতে গুরুভার দেহ, কমনীয় বর্তুলাকৃতি ডৌল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন মূর্তিতে দেহের মাংসলতা অপেক্ষা তনুর ক্ষীণতাই চোখে পড়ে। এইসব মূর্তির ভ্রূ, চক্ষু, নাসিকা, ঠোঁট, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের ভাঁজগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য স্বল্প গভীর তীক্ষ্ণরেখার ব্যবহার চলিত ছিল।

এই যুগের মূর্তিগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলির সবই প্রায় অর্চনার উপযোগী দেবদেবীর মূর্তি, এক কথায় সাধারণতঃ যাদের অর্চা বা প্রতিমা বলা হয়ে থাকে তাই। শিল্পে অর্চনার উপযোগী প্রতিমার উদ্ভবের কাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মোটামুটি এই কথা বলা যেতে পারে যে গুপ্তযুগেই প্রতিমানির্মাণ শিল্পের পূর্ণবিকাশ হয়েছিল; প্রতিমা নির্মাণের খুঁটিনাটি নিয়েও এই যুগেই বহু আলোচনা হয়েছিল ও তার সাহিত্য রচনা হয়েছিল। কোন্ দেবমূর্তির গঠনে কি কি বিশিষ্টতা থাকবে তার নির্দেশ দিয়ে বহু ধ্যানও এই যুগেই আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী যুগে দেবমূর্তি নির্মাণে সর্বদা এই সব ধ্যানই অনুসরণ করা ছাড়া শিল্পীর আর কোন স্বাধীনতা ছিল না। এই সকল ধ্যানে দেবতার আকৃতি, তাঁর দাঁড়াবার, বসবার বা শয়ন করবার ভঙ্গী, তাঁর বাহন এবং মূল দেবতার সঙ্গে অন্য কোন কোন মূর্তি দেখাতে হবে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সাধক আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্যান রচনা করলেও গুপ্তযুগেই দেবমূর্তিগুলির পরিকল্পনা একরূপ স্থির হয়ে গিয়েছিল; পরে সেগুলির সামান্য অদল বদল ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় নাই। পাহাড়পুরের প্রস্তর-ফলকগুলির মধ্যে যেগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি দেবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে সেগুলিকে ঠিক খাঁটী প্রতিমা বলা চলে না। এগুলি সম্ভবতঃ মন্দিরের প্রাচীরসজ্জার জন্যই নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে

প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবার প্রয়োজনে যে মূর্তির উদ্ভব তাতে কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। স্তূপ, গুহাচৈত্য বা মন্দিরের প্রাচীরে বা প্রাচীরবেষ্টনীতে উৎকীর্ণ বা সন্নিবিষ্ট মূর্তি দিবালোকে সর্বাঙ্গীন ভাবে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়—মন্দিরাদি এই সব মূর্তির পশ্চাদ্‌পটের কাজ করে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে যে সব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মন্দিরের গর্ভগৃহ অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রায়ান্ধকার; শুধুমাত্র ঘৃতের প্রদীপের মৃদু আলোকে যা কিছু প্রদীপ্ত; এই অনুজ্জ্বল পরিবেশে অনুচ্চ বেদীর উপর প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করা হত, তাও প্রাচীর ঘেঁষে নয়। এই জন্য প্রতিমার স্বকীয় একটি পৃষ্ঠপটের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল; এই পৃষ্ঠপট আলোক প্রতিফলিত করায় মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশও সহজেই ভক্তের চোখে পড়ত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে তাই সকল প্রতিমাকেই প্রায় একটি পৃষ্ঠপটের উপর উৎকীর্ণ দেখতে পাই।

দেবদেবীর মূর্তির শিরোভাগের পশ্চাতে প্রায় সকল দেশেই চক্রাকৃতি একটি মণ্ডল সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায়। ভারতীয় সাহিত্যে এই মণ্ডলের নাম শিরশ্চক্র বা প্রভামণ্ডল। গোড়ার দিকে যখন প্রতিমাতে পৃষ্ঠপট সংস্থানের রেওয়াজ ছিল না তখন মাথার পশ্চাদবর্তী মণ্ডলটি স্কন্ধের শীর্ষেই সংশ্লিষ্ট করে দেখান হত ( ষষ্ঠ শতাব্দীর সূর্য-মূর্তি )। পিছনে পট-সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর সেই পটেরই শীর্ষদেশ অর্দ্ধমণ্ডলের আকারে রূপ দেওয়া হল; এবং পটের উপর স্বল্পগভীর রেখায় আঁকা একটি চক্রই মণ্ডলের কাজ করত। পটের প্রান্তদেশ-স্পর্শী একটি অগভীর রেখা ছাড়া সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর মূর্তিতে আর কোন অলঙ্কার বড় একটা দেখা যায় না। মূল-মূর্তিগুলি সাধারণতঃ একটি পূর্ণবিকশিত যুক্ত-পদ্মের উপর দাঁড়ান বা বসা অবস্থায় পরিকল্পিত হত। পটের মধ্যভাগে অনুচ্চভাবে

উৎকীর্ণ মূলমূর্তি দৈর্ঘে পটের তিন- চতুর্থাংশ ভাগ অধিকার করবে, আর প্রধান পার্শ্ব-মূর্তিগুলি হবে মূল মূর্তির তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ উঁচু—এই ছিল সাধারণ মাপ। প্রতিমার গড়নের ধারাটি এই যুগে মোটামুটি এই রকমই ছিল।

উপরে বর্ণিত সূর্যমূর্তিটি ছাড়া আমাদের চিত্রশালার আর যে সব মূর্তিকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর সৃষ্টি বলে ধরা যেতে পারে তাদের মধ্যে ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামের বিষ্ণু মূর্তিটিতে অন্য মূর্তি থেকে স্বতন্ত্র কয়েকটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। চতুষ্কোণ একখানি ফলকের উপর অগভীর ভাবে উৎকীর্ণ মূর্তিটি দৈর্ঘে অনতিবিস্তৃত কিন্তু আয়তনে একটু প্রশস্ত। শীর্ষ দেশ ও দুই প্রান্তের অনুচ্চ বন্ধনী, সুপরিস্ফুট বাদামী আকারের চক্ষু ও তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অলঙ্কার ও পরিধেয়ের ভাঁজ মূর্তিটিকে অনেকটা আদিম ধর্মী করে রেখেছে (দ্বিতীয় চিত্র)। সুন্দরবন অঞ্চল থেকে এই ধরণের আরও কয়েকটি ফলক আবিষ্কৃত হাওয়ায় এই ধরণের স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন একটি বিশিষ্ট ধারার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়।

নবম শতাব্দীতে পটের উপর মূর্তি বিন্যাসের ও পটের সজ্জার যে পরিবর্তন ঘটে তা খুব উলেখযোগ্য না হলেও মূর্তির মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন-ভঙ্গীতে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে কোন কোন মূর্তির শীর্ষভাগের দুই পার্শ্বে দুইটি শূন্যে বিচরণশীল ক্ষুদ্রাকৃতি বিদ্যাধর মূর্তির আবির্ভাব চোখে পড়ে। এছাড়া পটের পার্শ্ব ভাগের একটি বা দুইটি অগভীর রেখার জায়গায় স্বল্প প্রশস্ত প্রলম্বিত বস্ত্রখণ্ডের আকারের অলঙ্কারের আবির্ভাব হতে দেখা যায় (গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু মূর্তি, তৃতীয় চিত্র)। এই অলঙ্কার কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে

যুক্তপদ্মের আসন পর্যন্তও বিস্তৃত হত ( উমা-মহেশ্বর মূর্তি, চতুর্থ চিত্র )। এই শতাব্দীর শেষভাগেই পটের শীর্ষভাগ সূক্ষ্মাগ্র হতে আরম্ভ হওয়াতে আর একটি গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। দেবদেবীর শিরশ্চক্র প্রধানতঃ পুঞ্জীভূত জ্যোতির মণ্ডল বলে কল্পিত হলেও কোন কোন জায়গায় এই মণ্ডল প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আকারেও উৎকীর্ণ হয়েছে। এই অগ্নির ঊর্ধ্ব গমনশীল শিখা এই সব ক্ষেত্রে মণ্ডলটিকে সূক্ষ্মাগ্র করে তুলত। পটের শীর্ষভাগ সূক্ষ্মাগ্র হয়ে ওঠার মধ্যে এই কৌশলেরই অভিব্যক্তি রয়েছে বলে মনে হয়।

নবম শতাব্দীর গোড়াতে কোন কোন মূর্তির মুখমণ্ডল গোলাকৃতি থাকলেও শেষের দিকে এই মুখ কিছু পরিমাণে দীর্ঘায়ত হয়ে উঠল; ভ্রূ বঙ্কিম হল, চক্ষু বাদামী, কোন কোন ক্ষেত্রে অগভীর রেখায় চোখের মণি খচিত হল। সূচনায় গড়ান স্কন্ধ ও মাংসল বক্ষদেশের অস্তিত্ব দেখা গেলেও পরে গুপ্তযুগের এই মাংসল কোমলতার ভাব অতিক্রম করে— স্বল্প পরিসর ক্ষীণ মসৃণ দেহের দিকে ঝুঁকবার প্রয়াস দেখা দেয়। দেহ পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘ, অলঙ্কারগুলি বেশ গভীর রেখায় নির্দিষ্ট ও পরিধেয়ের ভাঁজ দুই-দুইটি ঢেউ খেলান স্বল্প গভীর রেখার দ্বারা চিহ্নিত হতে লাগল।

আমাদের চিত্রশালায় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর যে সব মূর্তি আছে সেগুলির মধ্যে দিনাজপুরের গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি নভোমণ্ডলে সঞ্চরমান গরুড়ের কাঁধের উপর দর্শকের মুখোমুখী উপবেশনে রত। মুখমণ্ডল এখন গুরুতর রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলেও গোড়াতে সুগোল আকৃতির ছিল বলে মনে হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ ও গোল এবং দেহ মাংসল হওয়ায় গুপ্তযুগের দেহ-গঠনের রেশ চোখে

পড়ে। গরুড়ের আকাশপথে উড়ে যাওয়ার সাবলীল ভঙ্গীটী খুবই চিত্তাকর্ষক।

মূর্তির গঠনভঙ্গী ও পটের অলঙ্করণ এই উভয় ক্ষেত্রেই নবম শতাব্দীকে বোধ হয় শিল্পীর স্বকীয় প্রতিভার পূর্ণবিকাশের পথে পরীক্ষামূলক সংগ্রামের যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। পরবর্তী যুগে যে লক্ষণগুল পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ভাস্কর্যের এক কল্পজগতের সৃষ্টি করেছিল তার প্রায় সমস্তগুলিরই সূচনা সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে দেখতে পাই।

শিল্পীর মানস দ্বন্দ্বের কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয় নাই; গুপ্ত যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য এখনও তার মনকে বহুদূর পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বহিরাগত প্রভাবের শিকল ভেঙ্গে এখনও তার প্রতিভা, যে পথে তার পূর্ণবিকাশ সম্ভব, সেই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করতে সাহস পাচ্ছে না। কোনও কোনও মূর্তিতে সে স্বকীয় ধারাকে অবলম্বন করে দাঁড়ালেও পরক্ষণেই অন্য মূর্তিতে তার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে পড়ছে। নবম শতাব্দীকে তাই আমরা দ্বন্দ্ব, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার সঙ্কটময় যুগ বলে অভিহিত করতে পারি।

এই সঙ্কট অতিক্রম করে দশম শতাব্দীতে শিল্পীকে স্বকীয় রীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আর দ্বিধার অবকাশ নাই, আপনার নির্ণীত রীতির উপর আর অবিশ্বাস নাই এবং সর্বোপরি গুপ্ত ভাস্কর্যের লক্ষণগুলির উপর থেকে অহেতুক মোহ অপসৃত হয়ে গেছে। দশম শতাব্দীর মূর্তি-শিল্প তাই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

এ-যুগে মূর্তির দেহগঠনে যে দীঘল পূর্ণতা এসেছে তেমনিটি পূর্বে আর দেখা যায় নাই। সকল মূর্তির দেহই বেশ শক্তিপূর্ণ, হাত পায়ের ভঙ্গী গতি-শীলতাগুণে সমৃদ্ধ। মূর্তির মুখমণ্ডল দীর্ঘ ছাঁদের হলেও বেশ শ্রীমণ্ডিত,

দেহ ক্ষীণ ও স্বল্পপরিসর কিন্তু তারই মধ্যে কোমল ও নমনীয়। ভ্রূ, চক্ষু, নাসিকা, ওষ্ঠ, অলঙ্কার ও বসনের ভাঁজের রেখায় পুরাতন তীক্ষ্ণতা আর চোখে পড়ে না—এই রেখাগুলি এখন অনেক মার্জিত, এবং দেহের ডৌলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখমণ্ডল, শক্তিগর্ভ কোমল দেহ, মার্জিত অলঙ্কার এবং পার্শ্বমূর্তির সংস্থানের বৈচিত্র্যে দশম শতাব্দীর মূর্তিগুলি শিল্পজগতে একটা বৈশিষ্ট্যময় স্থান অধিকার করে আছে।

. মূর্তির দেহগঠন-ভঙ্গীর যে বিশেষত্ব দশম শতাব্দীতে চোখে পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপটেরও কিছু কিছু পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। এই যুগে পটের শীর্ষদেশ বেশ পরিদৃশ্যমান ভাবেই সূক্ষ্মাগ্র হয়ে উঠেছিল এবং ঠিক এরই তলভাগে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে একটি বিচিত্র ধরণের অলঙ্কারের আবির্ভাব হল। এই অলঙ্কারটি শিল্পের ইতিহাসে কীর্তিমুখ নামে খ্যাত। বহু প্রাচীনকাল থেকে শিল্পে এই বিশিষ্ট আকৃতি, ঘোর চক্ষু, ত্রিকোণ-লোল জিহ্বা কল্পিত জীবটির ব্যবহার চলিত থাকলেও দশম শতাব্দী থেকেই প্রতিমার পৃষ্ঠপটের শীর্ষে কীর্তিমুখের উপস্থিতি প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী যুগে কীর্তিমুখকে আরও অদ্ভুত দর্শন করে তুলবার চেষ্টা কম হয়নি। বৃহত্তর ভারতের শিল্পে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই কীর্তিমুখ বিশেষ করে মন্দিরের অলঙ্করণ ও মণ্ডনে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে ছিল।

দশম শতাব্দী থেকে মূলমূর্তির মস্তকের পশ্চাদভাগে প্রদর্শিত প্রভা-মণ্ডলটি অগ্নিশিখা বা পদ্মে গড়া মালা ইত্যাদি অলঙ্কারে মণ্ডিত হতে থাকে। কোন কোন মূর্তিতে মূলমূর্তির স্কন্ধের সমান্তরালে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের অনুরূপ চিত্রও উৎকীর্ণ দেখা যায়। নবম এবং দশম শতাব্দীর

কোন কোন মূর্তির পৃষ্ঠপট হুবহু মন্দিরের অনুকরণে গ্রথিত হয়েছে দেখা যায় আর মূর্তিটি যেন মন্দিরের মধ্যেই আসীন।

বর্তমানে আমাদের চিত্রশালায় আনুমানিক দশম শতাব্দীর যে সব মূর্তি রয়েছে তাদের মধ্যে পরিকল্পনা ও গঠন সৌকর্যের দিক থেকে হুগলী জেলার লোকেশ্বর মূর্তি ( পঞ্চম চিত্র ), অগ্রদিগুণের একটি নারীর মুখমণ্ডল ( ষষ্ঠ চিত্র ), সুন্দরবনের একটি বিষ্ণু মূর্তি ( সপ্তম চিত্র ), এবং সুন্দরবনের একটি গণেশের মূর্তিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পটসংস্থানের যে রীতি সাধারণতঃ অন্যান্য প্রচলিত মূর্তিতে অনুসরণ করা হয়েছে হুগলীর লোকেশ্বর মূর্তিতে সেই রীতির কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। প্রায় চতুষ্কোণ একখানি ফলকের উপর বিন্যস্ত মূর্তির বঙ্কিম দাঁড়াবার ভঙ্গীটি অত্যন্ত লালিত্যপূর্ণ। মূর্তির মাথায় জটামুকুট, দেহে বিবিধ অলঙ্কার; বাম করে লীলা পদ্ম, দক্ষিণ কর বরদমুদ্রায় ধরা ছিল। পৃষ্ঠপটের বাঁদিকে একটি চিত্রিত ঘটের মুখ থেকে একটি বৃক্ষ নির্গত হয়ে মূলমূর্তিকে আবেষ্টন করে পটের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে একটি বিচিত্র নক্সার সৃষ্টি করেছে। খর্বাকৃতি স্থূল দেহ এক বামন মূর্তি বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করে আছে; তারই কিছু উপরে বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট চারিটি অনুচ্চ পদকে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি চক্রবর্তিত্বের কয়েকটি লক্ষণ উৎকীর্ণ। মূর্তির দক্ষিণে ক্ষুদ্রাকৃতি সূচীমুখ ও দুইটি অপ্রধান মূর্তি। পরিধের এবং অলঙ্কারের গভীর রেখাগুলি মূর্তির কমনীয় দেহের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারলেও দেহের তারুণ্য ও নমনীয়তা ও দাঁড়াবার লীলায়িত ভঙ্গী এবং পট সংস্থানের বৈচিত্র্যে মূর্তিটি তার বৈশিষ্ট্য সূচিত করছে। এর পরে, বহু আঘাতে দীর্ণ, ছিন্ন কণ্ঠ, মস্তকমাত্র অবশিষ্ট অগ্রদিগুণের নারী মুখমণ্ডলটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তির

মুখের গড়নটি লম্বা ধাঁচের, কেশপাশ পরিপাটি করে সাজান ; বঙ্কিম ভ্রূর তলায় ভারী পল্লবে অর্দ্ধেক ঢাকা মণিচিহ্নিত চক্ষু, পুরু নিম্নোষ্ঠ এবং অল্প খোলা ঠোঁট দুটির ভিতর দিয়ে উপরের দশন পংক্তি ঈষৎ বিকশিত হয়ে আছে। এই সব বিচিত্র লক্ষণগুলির সমন্বয়ে একটি বিষাদ মিশ্রিত হাসি ফুটিয়ে তুলে শিল্পী মূর্তির মুখখানিতে একটি অনবদ্য মাধুর্যের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে এই মূর্তিটিকে সমসাময়িক কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

আমাদের চিত্রশালার আর যে সব মূর্তিকে আনুমানিক দশম শতাব্দীর সৃষ্টি বলে মনে হয় তাদের মধ্যে মহাপরিনির্বাণকালীন বুদ্ধের মূর্তি-সম্বলিত একটি ফলক ও বসিরহাট অঞ্চলের একটি বিষ্ণুচক্রই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমলপীঠের উপর স্থাপিত শয্যায় শয়ান বুদ্ধ-দেবের কোমল দেহ, আননের মৃত্যুযন্ত্রণালেশহীন প্রশান্ত ঈষৎ হাস্য সমন্বিত ভাব, পৃষ্ঠপটে উৎকীর্ণ বিলাপপরায়ণ ভক্তগণের মূর্তিগুলি উচ্চ-স্তরের শিল্পকৃতিত্বের পরিচায়ক। পৃষ্ঠপটের শীর্ষদেশে পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ-বিষয়ক চিত্র বাংলায় খুব দুর্লভ।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত চক্রমধ্যস্থ গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু মূর্তিটি সম্ভবতঃ প্রতিমা রূপে পরিকল্পিত বা ব্যবহৃত হয়নি ( অষ্টম চিত্র )। কমলাকৃতি স্বল্পায়তন পীঠের উপর স্থাপিত চক্রটি তিন ভাগে গ্রথিত। বহির্ভাগের বৃহদায়তন চক্রটির দেহ অগভীর আবর্তিত বা জড়ান ( scroll ) অলঙ্কারে মণ্ডিত। মধ্যভাগে অনুরূপ একটি স্বল্পায়তন পদ্মমধ্যস্থ বরফির আকারে সজ্জিত চক্রের মধ্যে মূলমূর্তিটিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। পদ্মকোরকের আকৃতির দ্বাদশটি শলাকা ( আরা ) এই উভয় চক্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে।

দুইটি হাত মাথার উপরে তুলে চতুর্ভুজ বিষ্ণু গরুড়ের কাঁধের উপর নৃত্য করছেন। গরুড়ের হাত দুটি ভক্তিতে অঞ্জলিবদ্ধ। গরুড়ের আকাশে সঞ্চরণ করবার অনায়াস ভঙ্গী ও বিষ্ণুর নৃত্যের লীলা চঞ্চল ঢংটি অপূর্ব। ভারতবর্ষীয় দেবমূর্তি পরিকল্পনায় নটরাজ শিব ও নৃত্যপর গণেশের মূর্তি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকলেও এই ধরণের নটনারায়ণের মূর্তি আর কোথাও পাওয়া যায়নি। দুই দিকে একইরূপে খোদিত চক্রটি সম্ভবতঃ কোন উচ্চচূড় বিষ্ণু-মন্দিরের বা মন্দির প্রাঙ্গনস্থ স্তম্ভের শোভা সম্পাদন করত।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যে নূতন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান খুব বেশী পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত অর্জিত যে-সমস্ত অভিজ্ঞতা দশম শতাব্দীতে একটি স্বাধীন ও স্বকীয় রূপ গ্রহণ করেছিল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্পীকে সেই সব অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে দেখা যায়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে ভাস্কর্যে যে-সব লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই পর্যায়ক্রমে এই যুগের মূর্তিতে চূড়ান্ত বিকাশলাভ করেছে। অতীতের অভিজ্ঞতা এই যুগের শিল্পীকে অনায়াসে আপনার কাজে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল। কোন বিশেষ বৈচিত্র্য তার গঠিত মূর্তিকে কি বিশেষত্বে মণ্ডিত করবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখমণ্ডল বা পটের খুঁটিনাটিগুলি কিভাবে সামঞ্জস্য সম্পন্ন হয়ে তার সৃষ্টিকে অপূর্ব শ্রী ও মাধুর্যে সমৃদ্ধ করে তুলবে এই সব বিষয়গুলি এই যুগের শিল্পীর বিশেষভাবেই আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। অতীতের অর্জিত ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বহুদিনের অভ্যাসে লব্ধ একটি গভীর শিল্পবোধের পটভূমিতে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ভাস্কর্য গড়ে উঠেছিল অন্য কোনও যুগে বাংলায় কিম্বা অন্য কোথাও তার তুলনা খুব সহজলভ্য নয়।

মূলমূর্তির ক্ষেত্রে যে-সকল পরিবর্তন কিম্বা সজ্জাবহুলতার প্রবর্তন হয়েছিল তদপেক্ষা পৃষ্ঠপটের ঐশ্বর্যই অধিকতর চোখে পড়ে। পৃষ্ঠপট এই যুগে এসে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার মধ্যে শীর্ষভাগের সূক্ষ্মাগ্রতা ও তন্নিম্নস্থ ব্যাপকভাবে অলঙ্কৃত কীর্তিমুখের দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

পটশীর্ষের বিদ্যাধর মূর্তি দুইটি থেকে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে গুচ্ছে গুচ্ছে আবর্তিত অলঙ্কারের তলায় বীণাবাদনরত কিন্নর ও কিন্নরী মূর্তি দেখা যায়। তারও তলায় মূলমূর্তির দুই পাশে দুইটি শার্দূল বা গজ-সিংহ মূর্তি; তারও তলায় কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর দুই একটি মূর্তি দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের কোনও এক স্থান থেকে সংগৃহীত গৌরী মূর্তিতে শার্দূলের তলদেশে এক পাশে গণেশ ও অন্য পার্শ্বে কার্তিকেয়ের অত্যন্ত মনোরম দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। তারও নীচে মূলমূর্তির উভয় পার্শ্বে ধ্যানানুমোদিত বিভিন্ন মূর্তির সমাবেশ দেখা যায়। সূর্যমূর্তির ক্ষেত্রে উষা ও প্রত্যুষা ইত্যাদির মূর্তি, বিষ্ণুর ক্ষেত্রে শ্রী ও ভূমির মূর্তি ইত্যাদি বিহিত আছে। মূলমূর্তি ও আনুষঙ্গিক অন্য সব মূর্তি এবং অলঙ্কারই এই যুগে এসে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চ এবং বাহুল্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাদপীঠটি মূলমূর্তির বাহন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তের মূর্তি ও অন্যান্য অলঙ্কার সম্বলিত পঞ্চরথ বেদীর আকারে গঠিত হত। এই বেদীর দুই প্রান্ত থেকে মূলমূর্তির স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত দুইটি স্তম্ভাকৃতি অবলম্বনের উপর দুইটি মকরমুখবিশিষ্ট খিলানের আকারে মন্দিরদ্বারের অনুকৃতি দেখা যায়।

পূর্ববর্তী যুগেই এই সব লক্ষণের কিছু কিছু পূর্বাভাব পাওয়া

গেলেও একাদশ শতাব্দীতেই এই সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। পূর্বোক্ত উপায়ে মোটামুটি সমগ্র পটটিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হ'ত। নিম্নে পাদপীঠ, মধ্যভাগে মন্দির বা মন্দির-দ্বারের মধ্যে মূলমূর্তির অধিষ্ঠান আর এই চতুষ্কোণ বন্ধনীর ( frame ) বাইরে কীর্তিমুখ, বিদ্যাধর, গজ-সিংহ ও পার্শ্বমূর্তি ইত্যাদির সমাবেশ। সমগ্র পটের এই ত্রিকল্প বিভাগ এই যুগ থেকে বাংলার মূর্তিকলার একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্তও এর খুব ব্যতিক্রম হয়নি। কলাচাতুর্যের দিক থেকে এই নূতনত্বের উপ-কারিতা অস্বীকার করা যায় না। মূল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য মূর্তি ও অলঙ্কারগুলিকে এই যুগ থেকে পশ্চাদপটের উপর অত্যধিক উচ্চতা সম্পন্ন করে দেখাবার দিকে ঝোঁক পড়েছিল। ফলে আনুষঙ্গিক মূর্তিগুলির এমন কি কীর্তিমুখ এবং বিচ্ছিন্ন ও আবর্তিত অলঙ্কারগুলিতেও মূলমূর্তি নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আবির্ভাব চোখে পড়ে।

এই ভাব যে কি পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি বীণাবাদিণী সরস্বতী মূর্তি এবং একটি লক্ষ্মী মূর্তিতে তার প্রমাণ আছে ( নবম ও দশম চিত্র )। মূর্তি দুটিকেই এক একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র মূর্তি বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় মূর্তিই বিষ্ণুমূর্তি থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। এই সকল বৈশিষ্ট্যই দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিমা ও পটের গুরুতর অলঙ্কার-বাহুল্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আনুষঙ্গিক অলঙ্কারবাহুল্য থেকে মূলমূর্তিকে স্বতন্ত্র ও প্রধান করে দেখাবার জন্যই পটের ত্রিকল্প বিভাগে মধ্যবর্তী মূল অংশকে স্বতন্ত্র করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে থাকতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবলম্বন স্তম্ভের উপর খিলানের পরিবর্তে আমলকশীর্ষ মন্দিরের অনুকৃতিও দেখা

যায়। এই মন্দিরের চৈত্য-গবাক্ষাকৃতি গহ্বরে মূলমূর্তিকে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন করে দেখান যেতে পারে; এমন অবস্থায় এই চৈত্যগবাক্ষের অনুকৃতিটি প্রভামণ্ডলের কাজ করে—এবং কীর্তিমুখটি মন্দিরের উপরে উৎকীর্ণ দেখা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই চৈত্যগবাক্ষের মুখটি অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত হয়ে থাকে: আমাদের চিত্রশালায় সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত কয়েকটি মূর্তির পার্শ্বভাগের খণ্ডমাত্র বিচ্ছিন্ন অংশ প্রদর্শিত আছে। এইগুলি তৎকালীন যুগে উদ্ভূত মূর্তির আনুষঙ্গিক অলঙ্করণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই প্রস্তরখণ্ডগুলিতে কয়েকটি সুদৃশ্য স্তম্ভের যথাযথ অনুকৃতি, আবর্তিত অলঙ্কারের উৎকর্ষ এবং বিচিত্র রাজহংস, গজ-শার্দুল ইত্যাদি দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ স্তম্ভের বিকল্পে সুদর্শন কদলীবৃক্ষেরও অনুকৃতি দেখা যায় ( ষোড়শ চিত্র )। পটের গায় এই সব বৈচিত্র্য সম্পাদনে শিল্পীর যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং সেইজন্যই পটের অলঙ্কারে এই সব বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাবেশ করা হ'ত। কিন্তু মূর্তিগঠনে শিল্পীর স্বাধীনতা ছিল খুবই কম। এক উমা-মহেশ্বরের মূর্তি ভিন্ন আর সব মূর্তিই সম্মুখীন ভাবে (frontal) দেখান হত—এবং এই সম্মুখীনতা সমস্ত মূর্তির ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসৃত হয়ে আসছিল। দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও ছিল একঘেঁয়ে। হাতের সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে চার কিম্বা ততোধিক হলেও হাত রাখবার ভঙ্গীও প্রায় সবক্ষেত্রেই ছিল অত্যন্ত নিয়মমাফিক। ফলে মুখাবয়বের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য, দেহগঠনের সামান্য বৈচিত্র্য এবং অলঙ্কার ও পরিধেয়ের কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া মূল-মূর্তিতে অন্য কোন বৈচিত্র্য সম্পাদনের সুযোগ একেবারেই ছিল না। এই কয়টি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সঞ্চারের সম্ভাবনা নিতান্তই কম থাকায় এবং মোটামুটি মূর্তিগুলির চেহারা ও দাঁড়াবার ভঙ্গী এক হওয়ায় এই যুগের

মূর্তিশিল্পে একটা একঘেঁয়েমির সঞ্চার হয়েছিল। শিল্পী তার সৃষ্টির এই দোষটি-সম্বন্ধে অচেতন ছিল না। প্রত্যেক যুগে এবং প্রায় প্রতিটি মূর্তির ক্ষেত্রেই তার এই ব্যক্তিচৈতন্য কাজ করেছে দেখতে পাওয়া যায়। বহু উপায়ে সে এই একঘেঁয়েমি থেকে তার সৃষ্টিকে রক্ষা করতে, বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে মূলমূর্তির মুখভাব ও দেহগঠনে বৈচিত্র্য সঞ্চার করতে, প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে। পীঠের অলঙ্কার সজ্জা নিয়ে সে যে খেলা খেলেছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। মূলমূর্তি নিয়েও তার পরীক্ষার শেষ ছিল না। দশম শতাব্দীর মূর্তির মুখমণ্ডলে ছিল একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা দিল ঔদার্য-পূর্ণ মৃদু হাসি ও প্রশান্ত লাবণ্য। মুখমণ্ডলের দীর্ঘ ধাঁচের গড়নের মধ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে সুগোল পরিপূর্ণ মুখের প্রবর্তন দেখা যায়—কিন্তু এ মুখ গুপ্তযুগের মাংসল সুপূর্ণ মণ্ডলায়িত মুখ নয়—এ মুখ ক্ষীণ ও মার্জিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে মূর্তিশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বে-গড়া মূর্তির মুখমণ্ডলে শিল্পী একটা অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল মাধুর্যের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মুখমণ্ডল বহু বিশিষ্ট গুণে প্রতিকৃতির আকারও ধারণ করেছিল। দিনাজপুর অগ্র-দিগুণ থেকে সংগৃহীত সেই নারীমূর্তিটির মুখমণ্ডলে এই ভাবটি সবিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়। মূর্তিটির চুল ফেরাবার আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গী, বিভিন্ন অলঙ্কারে সুউচ্চ প্রায় ব্যক্তিগত রুচির বিকাশ, চক্ষের ভারী পল্লবের বেদনাক্রান্ত ভাব এবং ঈষৎ বিকশিত দন্তের বৈচিত্র্য এই সব কিছুতে মিলিয়ে মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠেছে তাতে ব্যক্তিগত প্রতিকৃতির ভাবটি যেমন প্রবল শিল্পীর কৃতিত্বও তেমনি উচ্চস্তরের। মুখমণ্ডলের অন্যান্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ধনুকাকৃতি ভ্রূর প্রান্তভাগে পুনরায় আর

একটি ঊর্ধ্বগতির বঙ্কিম রেখা ও সুপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে বঙ্কিম ওষ্ঠাধরকে কোন কোন ক্ষেত্রে পলতোলা রেখা দ্বারা বিশেষিত করবার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে (দশম চিত্র)। গলার ত্রিবলী রেখা গুপ্তযুগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সমভাবেই বিদ্যমান ছিল; একাদশ শতাব্দী থেকে স্কন্ধের দুই পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র দেখা যায়—মূর্তির গলে রত্নহার বিলম্বিত করবার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

দেহগঠনের বৈচিত্রগুলির মধ্যে একাদশ শতাব্দীর মূর্তির সৌষ্ঠবপূর্ণ দৈর্ঘ্যই সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে। এই দৈর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দীতে অলঙ্কারবাহুল্যে ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মূর্তির প্রান্তরেখা তীক্ষ্ণ কিন্তু মূর্তির ক্ষীণ দেহের মধ্যেও একটা পেলবতার ভাব দেখা যায়। ফলে মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোমল ও মাধুর্যপূর্ণ। একাদশ শতাব্দীতে অলঙ্কারের স্বল্পতাই ছিল স্বাভাবিক, আর এই সব অলঙ্কারের রেখাগুলি ছিল মার্জিত এবং সযত্নে এই রেখাগুলি দেহের বর্তুলতার সঙ্গে মিলিয়ে দেহগঠনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখা হত। বসন ও উত্তরীয়ের রেখাগুলিও সযত্নে শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হত। কোন কোন ক্ষেত্রে এই রেখা অগভীর দুইটি সমান্তরালবর্তী রেখার সমন্বয়ে গঠিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব রেখা ছিল পলতোলা ধরণের। দেহকাণ্ডের দুই প্রান্তদেশ সুস্পষ্টরূপে যাতে দেখা যায় তার জন্য প্রান্ত থেকে পাথর কেটে বাদ দেওয়া হত। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই প্রক্রিয়া এতদূর পরিণতি লাভ করেছিল যে মূলমূর্তির সঙ্গে মাথা আর পায়ের তলা ভিন্ন পৃষ্ঠপটের আর কোন সংস্রব থাকত না (যশোহরের বিষ্ণুমূর্তি, ১২শ চিত্র)। মূলমূর্তির দেহের অলঙ্কার পৃষ্ঠপটের অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দ্বাদশ শতাব্দীতে এত বাহুল্যপূর্ণ হয়ে পড়েছিল যে অলঙ্কারযোগে দেহের যে মার্জিত শ্রী ইতিপূর্বেকার

মূর্তিতে ফুটে উঠেছিল—এই যুগে আর তার অবশেষ থাকল না—অলঙ্কারের ভারে মূর্তি হল ভারগ্রস্ত ; মূর্তির দেহগঠনে যে মাংসল পেলবতা একবার দেখা দিয়েছিল এই যুগে সেই মাংসলতাও দেহকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছিল। ফলে মূর্তির শ্রী অনেকটাই ব্যাহত হয়ে জড়তালক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

মূলমূর্তিতে গতিভঙ্গী দেখাবার উপায় যেমন একেবারেই ছিল না পার্শ্ববর্তী মূর্তিতে শিল্পী তেমনি বিচিত্র দেহভঙ্গী যোজনাদ্বারা আপনার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মূলমূর্তি সকল প্রশংসনীয় গুণের অতিরিক্ত গতিমাধুর্য্যযুক্ত হওয়ায় শিল্পের বিচারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অলঙ্কারবাহুল্য, দেহের ভার ও অন্যান্য কারণে প্রতিমার গঠন কতকটা নির্জীব হয়ে পড়ে। মূর্তির দেহগঠনে কোমলতা, সজীবতা, মাধুর্য ইত্যাদি যে সমস্ত মার্জিত বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল সেগুলিও যেন ক্রমে বিদায় নিতে থাকল। শেষ পর্যন্ত অতি ভারাক্রান্ত মূর্তি অলঙ্কার ও সম্ভারবাহুল্যে যা' হয়ে দাঁড়াল, বেদনাদায়ক হলেও পাল মূর্তিশিল্পের উহাই ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর যে সমস্ত মূর্তির কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়া প্রতিমাতত্ত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ফলকের কথা না বললে আমাদের চিত্রশালার মূর্তিসমূহের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। এই সব ফলকের মধ্যে অগ্রদিগুণের উমা-মহেশ্বর মূর্তির ক্ষীণ দেহের কমনীয়তা, উমার মুখের (মহেশ্বরের মস্তকটি ভেঙ্গে গেছে) লালিত্যপূর্ণ সমর্পণের ভাবটি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের গুণে একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট

সৃষ্টি বলে পরিগণিত হতে পারে। সুন্দরবনের কঙ্কণদীঘির নবগ্রহ ফলকের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

* * *

ভাস্কর্যশিল্পের চর্চা বাংলায় বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও প্রস্তরে মূর্তিগঠনের রেওয়াজ এ-অঞ্চলে যে খুব প্রাচীন নয় একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবিষ্কৃত যে সমস্ত মূর্তিকে পণ্ডিতেরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করেছেন তাদের কয়েকটি হয়ত গুপ্ত কালেরও পূর্বে গড়া। অবশিষ্টগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে তৈরী। বহু প্রাচীনকাল থেকেই (সম্ভবত মৌর্য আমল থেকেই) কখনও কখনও বাংলাদেশ মগধে স্থাপিত বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও গুপ্তরাজাগণের আমলেই সম্ভবত উত্তর ভারতের সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের সংস্কৃতির প্রভাব ও সংস্পর্শ বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিচিত্র ফল প্রসব করে। গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে বাংলা সমগ্র না হলেও অংশতঃ যে সোজাসুজি মগধের আমলা-তন্ত্রদ্বারা শাসিত হত দামোদরপুর, পাহাড়পুর ইত্যাদি অঞ্চলের তাম্র-শাসনগুলি তার পরিচয় বহন করছে। এই যুগের যে কয়টি প্রস্তরমূর্তির উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে বিহারৈলের বুদ্ধমূর্তি গুপ্তযুগের প্রসিদ্ধ কলাকেন্দ্র সারনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পরিচয় দেয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যে উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিল তার রেষ পরবর্তী এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত অটুট থাকে। গুপ্তসাম্রাজ্যের আবেষ্টনচ্যুত হলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে

বাংলায় গুপ্তযুগে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। উত্তর-বাংলার দামোদরপুরে আবিষ্কৃত পঞ্চম তাম্রশাসনখানিতে উল্লিখিত গুপ্ত-উপাধিধারী সম্রাটের আমল ( ৫৪৪ খৃঃ অঃ ) থেকে ফরিদপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রাপ্ত তাম্রশাসনাবলীতে উল্লিখিত ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচার দেব, জয়নাগ এবং শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলাদেশ গুপ্তযুগের শাসননীতি, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলেও সক্রিয়ভাবেই একটা স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শশাঙ্কের রাজ্যকাল থেকেই বাংলাদেশ প্রবল বৈদেশিক আক্রমণে উপর্যুপরি পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে গুরুতর অরাজকতার লীলানিকেতনে পরিণত হয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্ঘাত ও সঙ্ঘর্ষের অন্তরালে যে শক্তি ও আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ জাগ্রত হয়েছিল পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল দেবের রাজ্যাভিষেকে যেন তারই প্রকাশ দেখতে পাই।

রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি কাঠামো জানা থাকলেও পর্যাপ্ত উপকরণের অভাবে সামাজিক জীবনে এই বিপ্লব জনিত পরিবর্তন কোন নূতন আদর্শ ও অনুপ্রেরনার সঞ্চার করেছিল তার কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তা হলেও সমসাময়িক সাহিত্য ও শিল্পকলায় সে যুগের মানুষের মনের যে পরিচয় রয়েছে তা থেকে তার সামাজিক অবস্থা ও সাধারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধেও কিছুটা আলোক সংগ্রহ করা দুরূহ নয়।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্ভবতঃ খাঁটি আর্য সংস্কৃতি-দ্বারা অভিষিক্ত হয় নাই; তাই শিষ্টতাভিমানী মধ্যদেশীয়দের নিকট বাংলা প্রায় অপাংক্তেয়ই থেকে গিয়েছিল। সেই যুগের কোন এক সময়ে জৈন-ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরকে রাঢ় অঞ্চলের রাজপথে বিমুখ জনগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়ে থাকলেও সমসাময়িক সাহিত্য পাঠে এই কথাই মনে হয়

যে সর্ব প্রথমে জৈনেরাই আর্য্য ভাষা ও আর্য্য ধর্মোদ্ভূত সংস্কৃতির আশ্রয়ে প্রবেশাধিকার দিয়ে বাংলাদেশকে সভ্য সমাজে জাতে তুলে নিয়েছিল। সেই থেকে পরবর্তী বহুদিন পর্যন্ত বাংলার সঙ্গে জৈন ধর্মের একটা গভীর যোগ ছিল, এবং আজ চিহ্নমাত্র অবশেষ না থাকলেও এক সময়ে বাংলা দেশে অসংখ্য জৈন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-বর্ষে ভ্রমণকালে হিউয়েন সাং বাংলার বহু অধিবাসীকে জৈন ধর্মাবলম্বী দেখতে পেয়েছিলেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অসংখ্য মূর্তির মধ্যে গুটিকয়েক জৈন মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়; এমন কি আমাদের চিত্রশালায়ও বিভিন্ন যুগে গড়া কতিপয় জৈন মূর্তি আছে। এই সব মূর্তির মধ্যে কোনটি উত্তরবাংলা, কোনটি দক্ষিণে সুন্দরবন ( একাদশ চিত্র ) ও কোনটি ফরিদপুর থেকে এসেছে।

এক দিকে জৈনেরা যেমন বাংলাদেশে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের সহায়তা করেছিল অন্যদিকে বৌদ্ধেরাও তেমনি ব্যাপকভাবেই বাংলায় আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ছাড়া বহু প্রাচীন কালেই বেদানুগ ব্রাহ্মণ্য ধর্মও যে বাংলায় আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল গুপ্তযুগের এক তাম্রশাসনে সামবেদী ব্রাহ্মণকে পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাপনের জন্য ভূমিদানের নিদর্শন থকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব কম ছিল না। পূর্বেই বলেছি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় পরিভ্রমণকালে হিউয়েন সাং বহু জৈন ধর্মাবলম্বী অধিবাসী ও জৈন প্রতিষ্ঠান দেখতে পেয়েছিলন। আমাদের চিত্রশালার জৈন মূর্তিগুলির মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলথেকে সংগৃহীত একটি পার্শ্বনাথের মূর্তির চিত্র এখানে দেওয়া হল। কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে দাঁড়ান অত্যন্ত সংবেদনশীল দেহধারী মূর্তিটির পার্শ্বে বিভিন্ন সারিতে

অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর্থঙ্করের মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। (একাদশ চিত্র) দশম শতাব্দীর এই মূর্তিটি ছাড়া আমাদের চিত্রশালায় বর্ধমান থেকে সংগৃহীত নবম শতাব্দীর উপবেশন রত একটি, একাদশ শতাব্দীর উত্তর বঙ্গ থেকে সংগৃহীত কষ্টি পাথরের একটি ও ফরিদপুরের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কাষ্ঠ নির্মিত আর একটি জৈন মূর্তি রক্ষিত আছে। জৈন ধর্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছু পরেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বোধ হয় বাংলায় তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই ভাবে নূতন ভাষা ও নূতন ধর্মকে আশ্রয় করে থাকলেও অনেক বিষয়েই আর্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র একটা ধারার পরিচয় বাংলাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য ভাষার স্বতন্ত্র ঢংএ (গৌড়ীয় রীতি) ও শিল্পরীতির স্বকীয়তায়ই বিশেষ করে প্রকাশ পেয়ে থাকলেও সামাজিক রীতি নীতিতে, উৎসব পরিকল্পনায় ও কারুশিল্পে এই বিশিষ্টতার সূক্ষ্ম বিকাশটি আরও গভীরভাবে চোখে পড়ে। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই উত্তর থেকে আনীত সংস্কৃতিকে একেবারে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করবার অনুদার প্রয়াস দেখা যায় না বরং একটা গ্রহণ ও সামঞ্জস্য বিধানের ভাবই এইসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট। অন্যদিকে স্বকীয়তা যেখানে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সেখানে বহিরাগত প্রভাবকে স্বীকার না করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বোধকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলার সংস্কৃতিকে দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য বিধান প্রচেষ্টার একটি বৈচিত্র্যময় ফল বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

শিল্পের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য প্রয়াস কিভাবে রূপ গ্রহণ করেছে তার কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। বাইরে থেকে বিভিন্ন সময়ে সে সব ভাবের প্লাবন এসেছে তার মধ্যে গুপ্ত আমলের ভাবপ্লাবনই সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য ছিল বলে মনে হয়। এই গুপ্ত আমলের পূর্বেকার স্থানীয় শিল্পরীতি কি ছিল তার পরিষ্কার পরিচয় না পাওয়া গেলেও একটা স্বকীয় শিল্পপদ্ধতি যে এখানে ছিল নিঃসন্দেহে সে কথা স্বীকার করে নেওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যদেশীয় রীতির দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলেও বাঙ্গলার শিল্পী সম্পূর্ণভাবে বহিরাগত পদ্ধতির নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। রাষ্ট্রীয় জগতেও এযুগে মধ্যদেশীয় রাজশক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসই দেখতে পাই। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করার ফলে বাংলার সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল শিল্পের ক্ষেত্রেও তার ছাপ সুস্পষ্ট।

ধর্মবিশ্বাসে পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের রাজত্বকালের প্রারম্ভে বৌদ্ধ ধর্মের ও বৌদ্ধধর্মাশ্রিত শিল্পের বিপুল প্রসার হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে পাল সম্রাটগণের আনুকূল্যে বহু নূতন বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল, পুরোনো বহু বিহার নূতন সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। এই বিহারগুলি এক দিকে যেমন বৌদ্ধধর্মাশ্রিত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় খ্যাতিলাভ করেছিল অন্য দিকে তেমনি এগুলি শিল্পানুশীলনেরও অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

পাহাড়পুর মন্দিরের (সোমপুর বিহার) প্রাচীরে সংলগ্ন ফলকগুলি থেকে পাল-পূর্ব যুগের বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই যুগের তাম্রশাসন ও প্রচলিত মুদ্রা থেকেও জানা যায় যে এ সময়ে বাংলায় যাঁরা রাজশক্তি পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী; বিশেষ করে শশাঙ্ক সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি পরম শৈব ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাহাড়পুর মন্দিরের প্রাচীরে খচিত বেশ কয়েকটি ফলকই শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাবের পরিচয় দিচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরে ব্রাহ্মণ্য তথা শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্য

দেবদেবীর মূর্তি সংস্থাপনের মধ্যেও মধ্যদেশ থেকে স্বতন্ত্র এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করা যায় যাকে পারস্পরিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি ঔদার্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মধ্যদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ে কখনও সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস হয়েছিল কিনা জানা না গেলেও বৃহত্তর ভারতে হিন্দু বৌদ্ধ মিলন যে সুদূর প্রসারী ফল প্রসব করেছিল বাংলায় তার সূচনা ও পরিণতি দুইই লক্ষ্য করা যায়। এই পরিণতির দিক থেকে অষ্টধাতুর শিব মূর্তিটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। (ত্রয়োদশ চিত্র)।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় যে একটি গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল তৎকালীন যুগের শিল্পের গতি ও প্রকৃতি অনুসরণ করলেও তা বুঝতে পারা যায়। এই যুগের পূর্বে প্রস্তর নির্মিত মূর্তির সংখ্যাল্পতা এবং ব্যাপক শিল্প প্রচেষ্টার অভাবের সঙ্গে পরবর্তী যুগের প্রস্তর-মূর্তির বিপুল প্রসার ও বহু ব্যাপক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সহজেই তুলনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে বাংলা অঞ্চলে বিরাট মন্দির, বিপুলায়তন বিহার ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। পূর্ববঙ্গের খড়্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মূর্তি ব্যতীত বাংলার অন্য সমস্ত মূর্তি কা'দের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। বাংলার বাইরে ইতিপূর্বেই বহুসংখ্যক বৃহৎ শিল্প মণ্ডিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নির্মাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ ছিল অর্থশালী শ্রেষ্ঠী ও ধনিক কুলের। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে ভারহুত, সাঁচী, বোধগয়া, অমরাবতী ইত্যাদির মত বিপুল জিনিষ গড়ে তুলতে হলে সমাজের এমন কতগুলি লোকের পৃষ্ঠ-পোষকতা দরকার যাঁদের হাতে অর্থের অপ্রাচুর্য নাই। বাংলায় এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের অভাব সম্ভবতঃ সমাজে অনুরূপ ধনশালী ব্যক্তিসঙ্ঘের অভাবই সূচিত করছে। এই রূপ বিপুল প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকলেও

শিল্পরস-সম্ভোগ-প্রিয়তার অভাব সম্ভবতঃ বাংলায় ছিল না এবং সুলভ আধারে গড়া শিল্প সামগ্রী সর্বসাধারণের দ্বারা ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হতে পারত ; কাজে কাজেই শিল্প তখনও গণ্ডীভুক্ত হয়ে পড়েনি।

পরে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও ধনের অসম বণ্টনের ফলে ও বহুল পরিমাণে অন্যান্য অঞ্চলের প্রভাবে বাংলায়ও শিল্প কেন্দ্রগত ও অর্থানুকূল্যের অধীন হয়ে পড়েছিল। এইবার মাটি ছেড়ে, বহু দূর থেকে আনীত দুর্মূল্য কৃষ্ণপ্রস্তরে মূর্তি গঠনের রেওয়াজ প্রচলিত হল এবং বিহার, মন্দির কিম্বা অর্থশালী ব্যক্তির গৃহে এই সকল মূর্তির অধিষ্ঠান হল। নূতন ও দুর্মূল্য আধারে বিত্তশালী ব্যক্তির আনুকূল্যে যে মূর্তিশিল্পের প্রবর্তন হল তার প্রভাব কিন্তু জনসাধারণও এড়িয়ে যেতে পারেনি। অর্থশালী ব্যক্তিরা স্বভাবতই সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং পরিচালক হওয়ায় সাধারণকেও তাদের কাছে আসতে হত, এবং ধর্মকে আশ্রয় করেই এই শিল্পের উদ্ভব হওয়ায় ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণ এই শিল্পের দ্বারা অতি সহজেই প্রভাবিত হয়েছিল। সেই কারণে মৃত্তিকা গঠিত শিল্পেও অচিরে প্রস্তর শিল্পের গভীর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। আবার অন্য দিকে প্রাচীন শিল্পীর বংশই বোধ হয় নূতন ধারার শিল্প গঠনের ভার নিয়েছিল। কাজে কাজেই বহু শতাব্দীর অনুসৃত শিল্প ধারাকে তারা একেবারে ভুলে যেতে পারেনি। এবং সেই হেতু স্থানীয় শিল্পের প্রভাবও এই নব গঠিত শিল্পধারায় গভীর ভাবেই অনুভূত হয়েছিল। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ শাসিত ও সমাজের উচ্চ স্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভূত হলেও এই শিল্পকে তাই অচিরেই বাংলার জন সাধারণ আপনাদের জাতীয় শিল্পে পরিণত করে নিয়েছিল।

এই শিল্পধারার গতি ও প্রকৃতি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এই মূর্তি-শিল্পকে উপভোগ করতে হলে বিশেষভাবেই তৎকালীন এই সামাজিক

পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজের আভ্যন্তরীণ বহুবিধ শক্তির কথা—যে সব শক্তি মূর্তি নির্মাণে আপনাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং গৌণ,—উভয় উপায়েই বিস্তার করেছিল। এই প্রসঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রে দেবমূর্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপ মানুষের মূর্তির অভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত্তিকায় কিন্তু শিল্পীর ইচ্ছানুরূপ বিষয়কে রূপ দেওয়াতে কোনপ্রকার বাঁধা ছিল না; ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার এই অভাব নূতন শিল্পধারার একটি বিশেষ দোষ। প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্প, ধর্মের নামে যাঁরা সমাজ শাসন করত, তাঁদের অনুশাসনে বাধা পড়েছিল; ধর্মের নামে বহুলাংশে তাঁরা শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন। ভাবপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার অভাবে শিল্পে যে দোষ সঞ্চারিত হয়েছিল তারই ফলে এই শিল্পধারা সমাজের নির্জীবতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সজীবতাও হারিয়ে ফেলেছিল; এই শিল্পধারার বিলোপের অন্যান্য কারণের মধ্যে এইটিও একটি প্রধান কারণ।

প্রতিপদে শাস্ত্রের কড়া অনুশাসন গোড়ার দিকে শিল্পীর কর্মধারাকে পঙ্গু করে রেখেছিল—তার ছেদনীর প্রতিটি আঘাতকে করে রেখেছিল দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে গোড়ার দিকে মূর্তিশিল্পে কেমন একটা অস্পষ্টতা দেখা যায়। কিন্তু শিল্পীর প্রভূত প্রাণশক্তি এই অস্পষ্টতাকে সহজেই অতিক্রম করে উঠেছিল। দশম শতাব্দী থেকেই শিল্পীকে আপনার সাধনায় স্বপ্রতিষ্ঠ হতে দেখা যায়। শাস্ত্রের অনুশাসন অত্যন্ত কঠিন, আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করবার সুযোগ অল্প। আর্যসংস্কৃতির স্বনিয়োজিত রক্ষকেরা দৃঢ়ভাবেই ক্ষীয়মান ধর্মকে রক্ষা করছেন—ফলে শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল একঘেয়ে। এই কঠিন শাসনকে অতিক্রম করে, ক্লান্তি দায়ক একঘেয়েমির মধ্যেও শিল্পী আপনার প্রাণধর্ম বজায় রেখে

বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করতে অগ্রসর হয়েছিল। ফলে শাস্ত্রীয় বন্ধনের মধ্যেই একটা সৌষ্ঠবপূর্ণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই। কৃষ্ণ-প্রস্তরের ক্ষীণ দৃঢ়বদ্ধ দেহ, স্পর্শনীল কোমল তনু, অলঙ্কারের সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতা, আননের প্রশান্ত মাধুর্য ও পদদ্বয়ের স্তম্ভ-সদৃশ অটলতা এই সকল গুণে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলার ভাস্কর্য অপূর্ব সৌন্দর্য ও নবীন শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠল।

কিন্তু ক্ষেত্র স্বল্পায়ত, এবং ফিরে ফিরে একই পাঠ পড়ে কখনও কখনও এসেছে/ ক্লান্তি। প্রতিমার সৌন্দর্য হয়েছে ব্যাহত। বারে বারে এই জড়তা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা হয়েছে নূতন নূতন মালমসলার সংযোগে ; মুকুট, কেশ, ভুরুর ভঙ্গী, মুখের ধাঁচ, দেহের গড়ন, অলঙ্কারের পারিপাট্য এবং পীঠ ও পটের কারুকার্যের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে এই একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা হয়েছে ; বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে অঞ্চল ভেদে। এই ধারার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় সেন আমলের প্রথমদিকে। একাদশ শতাব্দী থেকেই মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির সংখ্যাবাহুল্য অনুভব করা যায়। এর পর অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে কারুণ্য ও বাৎসল্যের দেবতা এই বিষ্ণুকে অবলম্বন করেই যেন বাংলার মূর্তিশিল্প রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। সেনরাজগণের আমলে যেমন নূতন করে সমাজ সংস্কারের প্রয়াস দেখা যায় তেমনি দেখা যায় উচ্চ নীচের ভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ—আর রাজশক্তির অনুমোদনে নবব্রাহ্মণ্যের অনুশাসন। এই শাসন একদিকে যেমন দৃঢ় ছিল, বিশেষ করে উচ্চনীচ ভেদের ক্ষেত্রে, আদর্শের অনুসরণের দিকে ছিল তেমনি শিথিল। এই যুগের সমাজের ছবি পড়েছে সাহিত্যে। জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধরের কাব্যগুঞ্জনে এ যুগের আকাশ ছিল

মুখর। এদের কবিতা উপলখণ্ডে প্রহত গিরি নির্ঝরের মতই ছিল উচ্ছ্বাস-বহুল ও ধ্বনি লালিত্যে পূর্ণ। এই ফেনায়িত কাব্যে সমাজের যে প্রতিচ্ছবি মুকুরিত হয়ে উঠেছে সংযম অপেক্ষা উপভোগ, শৌর্য্য অপেক্ষা বিলাসই যেন তার মূলমন্ত্র ছিল। ভাস্কর্যেও এই আদর্শের ব্যতিক্রম হয় নাই। মূর্ত্তির ক্ষীণদেহের চিক্কণতার স্থানে মাংসল পেলবতার পুনরাবির্ভাব এই আদর্শেরই ফল। অলঙ্কার ও কারুকার্যের বাহুল্য, পার্শ্ব-মূর্তিসমূহের গতিভঙ্গ, কাব্যের উচ্ছ্বাসবহুলতারই রূপান্তর; মুখমণ্ডলের অপূর্ব মৃদুহাস্যশীল ভাবটি এক অচিন্তনীয় মাধুর্য-লোকের সন্ধান নিয়ে এল।

কিন্তু এই লালিত্য ও উচ্ছ্বাসের মধুরতা ছিল নিতান্তই স্বল্পস্থায়ী। অচিরেই সংযমহীন বাহুল্যের অবলেপে মূর্তি গুরুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল; মূলমূর্তির ভাবৈশ্বর্য হল গৌণ। অলঙ্কার, কারুকার্য ও আভরণের বাহুল্য মূল মূর্তিকে অতিক্রম করে গেল। এই যুগের শেষ অবস্থায় দেখা যায় সব কিছুতেই বাহুল্য আছে—কিন্তু প্রাণের ঘটেছে অভাব।

শিল্পে এই প্রাণহীন বাহুল্যের অনুশীলনকে সমাজদেহের গুরুতর চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ বলে অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়। একঘেয়েমির চাপে শিল্পের ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রায় এমনি বাহুল্য পূর্বেও অনেকবার এসেছে—মূর্তিকে প্রায় মনে হয়েছে প্রাণহীন। কিন্তু যত্ন ও প্রচেষ্টার ফলে শিল্পী সে জড়তা কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু এ যুগের অস্থিরতা যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সমাজের বহুকালের পুঞ্জীভূত শক্তি যেন প্রকাশের অন্য পথ না পেয়ে উদ্দাম ভোগেই চরম সার্থকতা খুঁজছিল; শিল্পেও এসে পড়েছে তারই ছাপ। সাহিত্যে দেখি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির, ব্যক্তিগত ভোগসুখের প্রয়াস। শিল্পেও ব্যক্তিগত রুচির ও ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপ এসে পড়েছে। সমাজ ও

সমাজের যে ছাপ শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে সভ্যতার গতিপথে গুরুতর পরিবর্তনের বীজ আর গোপন থাকেনি, হয়ে পড়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট।

সভ্যতা ও কৃষ্টির বিবর্তন ও বিকাশপথে দেশেদেশে বিভিন্নসময়ে এমনি গুরুতর সঙ্কটকাল দেখা দিয়েছে। প্রতিটি সঙ্কটের অন্তরালে জাতির প্রভূতশক্তি লুক্কায়িত ভাবে কাজ করে--নিহিত থাকে নূতন রূপ, নূতন সাধনা ও নূতন সম্ভাবনার বীজ। এই সঙ্কট অতিক্রমকালের সামান্যতম ত্রুটি, পথ নির্ণয়ের ন্যূনতম বিচ্যুতি বহুদিনের জন্য—একটা জাতিকে গুরুতররূপে পঙ্গু করে দিতে পারে—এমন কি সমস্ত সম্ভাবনা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবও অনেক সময় পরিপূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।

সেন আমলের শেষ অবস্থা বাঙ্গালী জীবনের এমনি একটি যুগসন্ধির সময়। ইতিহাসের নির্দেশ অনতিক্রমনীয়। অতীতে যুগে যুগে সঙ্কট অতিক্রম করবার যে সহজ বুদ্ধি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রবহমান রেখেছিল বোধ হয় এই প্রথম সেই বুদ্ধি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলল। রাষ্ট্রীয় জীবনে তার পরাজয় শিল্পের ক্ষেত্রেও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল—সেন যুগের শেষ সময় পর্যন্তও নূতন নূতন মূর্তি এবং সেই মূর্তিকুলের আশ্রয়স্থল-রূপে মন্দিরাবলী নির্মাণে যে ব্যাপক কর্মপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিল তারই আকস্মিক অবসানে। সভ্যতার গোধুলি শিল্পপ্রেরণাকে আচ্ছন্ন করে দিল। কয়েক শত বৎসর তাই বাংলায় শিল্পপ্রচেষ্টার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে বিপ্লবের ছাপ। শিল্পের জগতে নিষ্ক্রিয়তা। অবশ্যই জাতির মৃত্যু ঘটে নাই; দীর্ঘদিনের প্রবহমান প্রাণশক্তি—সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে থাকলেও তার অবসান কোথায়? নূতন সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর

জাতির শিল্পপ্রবণতা আপনাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় সচেতন হয়ে উঠেছিল। শিল্পের সে আর এক নূতন যুগ। এযুগের ইতিহাসে ভাস্কর্যের দান যথেষ্ট মূল্যবান হলেও যুগের পরিবর্তন তার উপরে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে। উপকরণ হিসাবে পাথরের ব্যবহার এ যুগে আর বড় একটা হয় নাই। কিন্তু বাংলায় গঠন প্রতিভা তার চিহ্ন রেখে গিয়েছে দগ্ধ মৃত্তিকার অসংখ্য ফলকে। সে কাহিনী মৃৎ শিল্পের কাহিনী ; তার অনুপ্রেরণা, তার পৃষ্ঠপোষককুল ও তার পরিবেশ ভিন্ন। তা হলেও এ যুগে যে প্রস্তর মূর্তি একেবারে প্রস্তুত হয় নাই তা নয়। আমাদের চিত্রশালায় আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর যে একটি জগদ্ধাত্রী মূর্তি আছে বাংলার মূর্তি শিল্পের ইতিহাসে শুধু যুগের বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয়, রূপবোধের পরিচয় হিসেবেও তার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। যশোহর নলডাঙ্গা থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠপটের উপর বেশ উঁচু করে খোদাই কালো পাথরের এই মূর্তিটিতে, দেহ গড়নের ঋজু দৃঢ়তা, অলঙ্কারের স্বল্পতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংস্থানের কোণালো বলিষ্ঠতা, ও আননের দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ভাবটি মূর্তিটিকে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করে রেখেছে ( অষ্টাদশ চিত্র )।

সমসাময়িক কোন কোন মৃত্তিকা মূর্তির সঙ্গে এই জাতীয় মূর্তির ডৌলের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও মূর্তিশিল্পে যে নূতন পথ নির্দেশ এই প্রতিমাটিতে দেখা যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে পথ পরে আর অনুসরণ করা হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য মাটিতে গড়া মূর্তিশিল্পে বাংলার প্রতিভা এখনও সজীব এবং হয়ত নূতন পথ খুঁজে নিয়ে বর্তমান স্রোতবিমুখতা থেকে ত্রাণ লাভ করবে কিন্তু পাথরে গড়া মূর্তির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজ বলবার আর খুব বেশী কিছু নাই।

# পরিশিষ্ট

খৃষ্টীয় ১৮০৭ সাল থেকে ১৮১২ সালে বুকানন হ্যামিল্টন নামীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী কোম্পানীর তরফ থেকে পূর্বভারত জরীপ করবার সময় পাহাড়পুরে ধ্বংসাবশেষপূর্ণ একটি স্তূপ লক্ষ্য করে ছিলেন। সে যুগে স্তূপটি গোয়ালভিটার পাহাড় বলে পরিচিত থাকলেও হ্যামিল্টন সাহেব ঐ স্তূপের অন্তরালে একটি বিপুলায়তন মন্দির রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ইংরাজী ১৯২৩ সালে রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সঙ্গে সহযোগিতায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই মৃত্তিকাস্তূপ বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে খনন করে মৃত্তিকানির্ম্মিত বহু ফলক ও অন্যান্য প্রাচীন দ্রব্য আবিষ্কার করেন। কিছুকাল অনুসন্ধান কার্য বন্ধ থাকবার পর ১৯২৫ সালে সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ পাহাড়পুরে কাজ আরম্ভ করেন ও ১৯৩৪ সালে চতুষ্পার্শের আনুষঙ্গিক অনেক মন্দিরাদি নিয়ে বিপুলাতন মূলমন্দিরের খননকার্য শেষ হয়।

খৃষ্টীয় ৪৭৮ সালে ( ১৫৯ গুপ্তাব্দে ) বটগোহালী বলে একটি জায়গায় অবস্থিত একটি জৈন প্রতিষ্ঠানের সেবার জন্য এক ব্রাহ্মণ দম্পতি কিছু ভূমি দান করেছিলেন। যে তাম্রপট্টলীতে এই দানের উল্লেখ আছে সেটি পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই বট-গোহালীই সম্ভবতঃ আধুনিক গোয়ালভিটা। গুপ্তযুগে এখানে একটি জৈন প্রতিষ্টান থাকলেও পরে পালসম্রাট ধর্ম্মপালদেবের আমলে এখানে সোমপুর বিহার নামে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হয়েছিল।

পাহাড়পুর বর্ত্তমান বঙ্গ-আসাম রেলপথের কলিকাতা থেকে শিলিগুড়ি

যাবার পথে জামালগঞ্জ ষ্টেশন থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ন দীক্ষিত মহাশয় লিখিত সরকারি প্রত্নতত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত Excavations at Paharpur নামক পুস্তকে পাহাড়পুর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

## চিত্র পরিচয়

**প্রথম চিত্র ঃ** কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত সূর্যমূর্তি; প্রাপ্তিস্থান, ২৪পরগণা জেলার কাশীপুর; নির্মাণকাল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী। মুখমণ্ডলের গাম্ভীর্যপূর্ণভাব ও পূর্ণগতিতে একই দিকে ধাবমান অশ্বগুলির গতিশীলতা লক্ষ্যনীয়। (পৃঃ ১৯)

**দ্বিতীয় চিত্র ঃ** বালুকাগর্ভ প্রস্তরে গড়া বিষ্ণুমূর্তি; ২৪পরগনা জেলার বোড়াল গ্রামে প্রাপ্ত; সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী; (পৃঃ ১৯)

**তৃতীয় চিত্র ঃ** দিনাজপুর জেলার অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রস্তরে গড়া গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি; আনুমানিক নবম শতাব্দী। সম্পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে গড়া গরুড় পক্ষবিস্তার করে চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে কাঁধের ওপর উপবেশন করিয়ে নভোমণ্ডলে উড়ে যাচ্ছে। উপবেশনরত বিষ্ণুর অনুরূপ মূর্তি আর পাওয়া যায় নাই। (পৃঃ ২০)

**চতুর্থ চিত্র ঃ** দিনাজপুর জেলার অগ্রদিগুণের কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত উমা-মহেশ্বরমূর্তি; আনুমানিক একাদশ শতাব্দী। (পৃঃ ২০; ২৭-২৮)

**পঞ্চম চিত্র ঃ** কৃষ্ণপ্রস্তরে গড়া হুগলী জেলার লোকেশ্বরমূর্তি; দশম শতাব্দী। (পৃঃ ২৩)

**ষষ্ঠ চিত্র ঃ** কৃষ্ণপ্রস্তরে গড়া বিবিধ অলঙ্কার খচিত নারী মুখমণ্ডল; অগ্রদিগুণ, দিনাজপুর ; দশম শতাব্দী। (পৃঃ ২৩-২৪)

**সপ্তম চিত্র ঃ** সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত আনুমানিক দশম শতাব্দীর কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তির মস্তক ও জানুর নিম্নভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন দেহকাণ্ড। জানুর উপরে উৎকীর্ণ বনমালার খণ্ডিতাংশ মূর্তিটির বিষ্ণুমূর্তিরূপে পরিচয়ের কারণ। মূর্ত্তির দেহ অত্যন্ত চিক্কণ ও মার্জিত ; গলে অর্দ্ধচন্দ্রহার আম্রফলের আকৃতিতে কাটা মণিতে খচিত, বক্ষে স্থূল উপবীত, ও সূক্ষ্ম উত্তরীয়, কটিতে শৃঙ্খল শোভিত, মকরমুখ বন্ধনীখচিত মুক্তালহরী ও পরিধানে অতিসূক্ষ্ম রেখামাত্রেচিহ্নিত বস্ত্র। (পৃঃ ২৩)

**অষ্টম চিত্র ঃ** সুন্দরবন অঞ্চলে আবিষ্কৃত চক্রমধ্যস্থ গরুড়বিষ্ণু, কৃষ্ণ-প্রস্তরে গড়া, আনুমানিক দশম শতাব্দী। (পৃঃ ২৪)

**নবম চিত্র ঃ** সুন্দরবনঅঞ্চলে প্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত আনুমানিক একাদশ শতব্দীর বীনাবদিনী সরস্বতীমূর্তি। (পৃঃ ২৭)

**দশম চিত্র ঃ** আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণপ্রস্তরে গড়া লক্ষ্মী মূর্তি ; কোন বৃহৎ বিষ্ণুমূর্তি থেকে বিচ্ছিন্ন মুকুট, কুণ্ডল, হার, কেউর, কঙ্কণ, মেখলা ইত্যাদি বিচিত্র অলঙ্কারে শোভিত এই মনোহর লক্ষ্মী মূর্তিটিও সুন্দরবন থেকে এসেছে। (পৃঃ ২৭)

**একাদশ চিত্র ঃ** সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত আনুমানিক দশম বা একাদশ শতাব্দীর জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি ; বালুকা-প্রস্তরে গড়া। (পৃঃ ৩৪-৩৫)

**দ্বাদশ চিত্র ঃ** কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি, আনুমানিক একাদশ শতাব্দী। সমসাময়িক যুগের একটি সুগঠিত পূর্ণাবয়ব মূর্তির নিদর্শন। পটশীর্ষে কীর্তিমুখ, তার নীচে দুইদিকে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাল্যবাহী গন্ধর্বমূর্তি। মূলমূর্তির মস্তকের পশ্চাতে কারুকার্য শোভিত প্রভামণ্ডল। মাথায় মন্দির চূড়ার আকৃতির মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কৌস্তভ শোভিত মুক্তা ও বাঘনখহার, বক্ষে উপবীত ও উত্তরীয়, হস্তে কেউর, কটিতে মেখলা ও চরনে নূপুর। গলে দীর্ঘ বনমালা। দুই পার্শ্বে বীনাবাদিনী সরস্বতী ও চৌরী ও কমলধারী শ্রী বা লক্ষ্মী—পদতলে গরুড়। (প্রাপ্তিস্থান যশোহর)। (পৃঃ ৩০)

**ত্রয়োদশ চিত্র ঃ** অষ্টধাতুতে গড়া কমণ্ডলু ও অক্ষমালাধারী দণ্ডায়মান শিবমূর্তি। মস্তকের পশ্চাতে চক্রাকৃতি প্রভামণ্ডল। মস্তকে জটামুকুট, শীর্ষে অর্দ্ধচন্দ্র—তদুপরি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি যাকে বুদ্ধবলে অনুমান করে মূর্তিটিকে শিববুদ্ধের মূর্তি বলে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তির দুই পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গলের মূর্তি, তার নীচে দুইটি ক্ষুদ্রকায় ভক্তের মূর্তি, পাদপীঠের তলায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বৃষের মূর্তিও রয়েছে। প্রাপ্তিস্থান হবিবপুর, বরিশাল। (পৃঃ ১১)

**চতুর্দ্দশ চিত্র ঃ** ব্রোঞ্জের আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। প্রাপ্তিস্থান চট্টগ্রাম অঞ্চল।

**পঞ্চদশ চিত্র ঃ** কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর

বিষ্ণুপট্ট। পট্টটিতে মূর্তি সংস্থান লক্ষ্যনীয়। কেন্দ্র স্থলে চতুষ্কোণ বন্ধনীর মধ্যে সুখাসনে উপবিষ্ট বিষ্ণু, দুইপার্শ্বে শ্রী ও ভূমির মূর্তি, মূলমূর্তির শীর্ষে গজলক্ষ্মীর মূর্তি; চারিকোনে চারিটি বিদ্যাধরের মূর্তি। প্রাপ্তিস্থান সেরপুর, বগুরা।

**ষোড়ষ চিত্র:** কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত দ্বারপার্শ্ব; শীর্ষে বিদ্যাধর মূর্তি, মধ্যভাগে গজশার্দুল, নিম্নে সুন্দর মন্দিরানুকৃতির অলিন্দে দণ্ডধরমূর্তি। প্রাপ্তিস্থান রাজসাহী। (পৃঃ ২৮)

**সপ্তদশ চিত্র:** কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত ময়ূরোপরি উপবেশনরত চতুর্ভুজ কার্তিকেয়। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী; প্রাপ্তিস্থান কালীগ্রাম, রাজসাহী।

**অষ্টাদশ চিত্র:** কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত কমলপীঠের উপর সুখাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ জগদ্ধাত্রী মূর্তি, পীঠের সম্মুখভাগে কাল্পনিক সিংহমূর্তি বংলার মধ্যযুগীয় শিল্পের সৃষ্টি। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দী। প্রাপ্তিস্থান বরিশাল।

১ সূর্য

বরুণ

৩ বিষ্ণু

৪ উমা-মাহেশ্বর

লোকেশ্বর

দেবী (?)

১১ ঋষভনাথ

১২

১৩ শিব-লোকেশ্বর

১৪ বুদ্ধ

১৫ বিষ্ণুপট্ট

১৬ দ্বার-পার্শ্ব